মিত্তির বাড়ির গুপ্তধন

অভীক সরকার



মিত্তির বাড়ির গুপ্তধন

মিত্তিরবাড়ির গুপ্তধন

অভীক সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা—৭০০০০৬

MITTIRBARIR GUPTADHAN
by Avik Sarkar
ISBN 978-81-952375-4-8
Phone 033-2241-2538 w 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২১

*প্রচ্ছদ ও অলংকরণ*ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক: শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক: কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

আমার পরম সুহৃদ, আত্মার আত্মীয়
শ্রী রাজা ভট্টাচার্য মশাইকে।

ভূমিকা

কিশোরদের জন্য একটি মনকাড়া গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার বহুকালের। সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মানোর প্রধান অনুঘটক ছিলো শৈশব ও শৈশোরে আনন্দমেলা-শুকতারা-কিশোরভারতী আদি বিভিন্ন পূজাবার্ষিকী। পটাশগড়ের জঙ্গলে, জঙ্গলমহলে গোগোল, সোনাঝরা গল্পের ইনকা, বিজয়নগরের হীরে, প্রফেসর শঙ্কু ও স্বর্ণপর্ণী, বাংলাসাহিত্যের মহীরুহদের রচিত এইসব আখ্যান, এসবই আমার অপাপবিদ্ধ শৈশোরের অম্লান স্মৃতি।

লেখালিখি শুরু করেছি বেশীদিন নয়। তবে শুরুতেই যে কথাটি যথাবিহিত হৃদয়ঙ্গম করেছি সেটি হচ্ছে যে কিশোরপাঠ্য উপন্যাস পড়া যতটা সহজ, লেখা ততটাই কঠিন। ওই জগতটা দেখা সহজ, বোঝা কঠিন। বুকে জড়ানো সহজ, ছুঁয়ে দেখা কঠিন।

সেই থেকেই বুঝেছি যে শিশুকিশোরসাহিত্যজগতে পা রাখতে গেলে মা সরস্বতীর বিশেষ আশীর্বাদ প্রয়োজন হয়। নচেৎ এই দুনিয়ায় প্রবেশের চাবিকাঠি মেলে না। সেই আশীর্বাদ কেউ কেউ পান। যাঁরা পান তাঁরা ভাগ্যবান।

তবুও অনেক সাহসে ভর করে লিখে ফেললাম এই ভুতুড়ে মজাদার অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসখানি। বলতে বাধা নেই, এটি লেখার সময় যাঁদের আমি লেখালিখির জগতে ঈশ্বর বলে মনে করি তাঁদের প্রভাব যে পুরোপুরি এড়াতে পেরেছি তা নয়। এমনকি সে চেষ্টাও যে খুব সচেতন ভাবে করেছি তাও নয়। ধরে নিন এই উপন্যাস আমার ফেলে আসা কৈশোরের প্রতি একটুকরো সহর্ষ প্রণতি।

পরিশেষে বলি যাদের জন্য লেখা, তারা যদি পড়ে খুশি হয়, তবেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

অভীক সরকার।

শুভ দোলযাত্রা
২৮শে মার্চ। ২০২১ সাল।

বিজয়া দশমীর রাত, আঠেরোশো নব্বই সাল, ঘুঘুডাঙা।

গ্রামের শেষে যে বড় বিলটা আছে, তার পাশে একটা অশ্বত্থের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয় যাচ্ছিলেন রতিকান্ত মল্লিক। হুগলি জেলার মশা যে কী ভয়াবহ সে নিয়ে তাঁর বিস্তর ধারণা ছিল, কম দিন হল না এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে অক্টোবরের শীতল মধ্যরাতেও যে এইরকম চড়াইপাখি সাইজের মশা হুল বাগিয়ে তেড়ে আসতে পারে সেটা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

দু-হাতে চট চট করে মশা মারতে মারতে সন্তর্পণে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। শয়তানের বাচ্চা গঙ্গাপদটা কোথায়? এখনই তাঁকে নিতে আসার কথা ছিল তা বাঁদরটার?

একটু নীচু হয়ে পায়ের কাছে রক্ত চুষতে থাকা একটা মশা মারলেন রতিকান্ত। আফ্রিকা থেকে আফগানিস্তান, তিব্বত থেকে বোর্ণিও, প্রাচ্যদেশের অনেক জায়গাতেই এইরকম টানটান উত্তেজনার রাত কাটিয়েছেন তিনি। এসব তাঁর প্রফেশনাল হ্যাজার্ড। কিন্তু এরকম অসভ্য রকমের মশার কামড় কখনোই সহ্য করতে হয়নি তাঁকে! বাপরে, এরা মশা না ভিমরুল?

মশাটা মেরে ফের ঘুঘুডাঙার জমিদার বাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। আজ দুর্গাপূজার শেষ দিন। একটু আগেই বিসর্জন হয়েছে। দশদিনের উৎসব শেষে সারা গ্রামের লোকজন আজ রাতে মড়ার মতো ঘুমোবে। আর এই সুযোগটাই চাই রতিকান্ত মল্লিকের।

রতিকান্ত মল্লিক একজন চোর। তবে যে সে চোর নন তিনি। রতিকান্ত চুরি করেন একমাত্র সেইসব জিনিস যার ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। গত কয়েক বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মন্দির আর বৌদ্ধস্তূপ থেকে যে যে বহুমূল্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন চুরি হয়েছে, প্রতিটির পেছনে রতিকান্ত মল্লিকের ধূর্ত বুদ্ধির ছাপ আছে। ইউরোপের বড়লোকদের মধ্যে এখন হিড়িক উঠেছে প্রাচ্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী কিনে ঘর সাজানোর। শুধু ঘর সাজানো নয়, অনেকে আবার শখের সংগ্রাহকও বটে। তাঁরা চোরাবাজারে এসব কিনে চেনা পরিচিতদের মধ্যে নিজেদের দর বাড়ান। আর এশিয়ার বাজারে তাদের মুশকিল আসান একজনই, দ্য গ্রেট রতিকান্ত মল্লিক।

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন রতিকান্ত। রাত আড়াইটে, চারিদিক নিস্তব্ধ। গঙ্গার দিক থেকে বয়ে আসছে আশ্বিনের ঠান্ডা শীতল হাওয়া। সেই হাওয়ায় বিলের পাশের জঙ্গল থেকে একটানা শনশন শব্দ শোনা যায়। জঙ্গলের বাইরের বাউন্ডারিতে জন্মানো বাঁশ আর অশ্বত্থের মাথাগুলো অল্প অল্প দুলছে। সেদিকে অবশ্য নজর ছিল না তাঁর, তিনি তাকিয়েছিলেন অন্য দিকে।

ঘুঘুডাঙা গ্রামের প্রধান রাস্তা যেখানে রাজবাড়ির ফটকের রাস্তার সঙ্গে এসে মিশেছে সেখানে একটা অতি প্রাচীন বটগাছ বহুকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রতিকান্ত যেখানে অপেক্ষা করছেন সেখান থেকে সেই মোড়টা দেখা যায়।

একবার বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিলেন তিনি। ভোর হতে আর বড়জোর দু-ঘণ্টা কুড়ি মিনিট আছে। তার মধ্যে গঙ্গাপদ না এলে মুশকিল। এর পর গ্রামের লোক এক এক করে জাগতে শুরু করবে।

একটু অস্থির হয়ে উঠলেন রতিকান্ত। দু-ঘণ্টা কুড়ি মিনিট মানে দু-ঘণ্টা উনিশ মিনিট হয়ে ষাট সেকেন্ড, তার একমুহূর্ত বেশি না। চুলচেরা প্ল্যানিং আর যন্ত্রের মতো নিখুঁত এক্সিকিউশন, এর ওপরে ভর করেই আজ অবধি এতগুলো সফল অপারেশন করেছেন তিনি। কোনও দেশের পুলিশের বাবার সাধ্য হয়নি তাঁর টিকি ছোঁয়ার। কিন্তু এই গঙ্গাপদ মনে হচ্ছে এত ট্রেনিং দেওয়ার পরেও ডোবাবে তাঁকে।

ভাবতে ভাবতেই সেই পুরোনো বটগাছের দিক থেকে রাতের অন্ধকার চিরে দ্রুত কিন্তু চাপা পায়ের শব্দ ভেসে এল রতিকান্ত'র কানে। একজন নয়, অনেকজনের পায়ের শব্দ।

ঠিক দুটো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো রতিকান্ত'র কাছে। তাদের মধ্যে একজন বললো, 'সাহেব, আছো?'

রতিকান্ত সতর্ক গলায় বললো, 'আছি, কিন্তু সঙ্গে ও কে?'

'ও এই গাঁয়েরই লোক সাহেব, আমার জিগরি দোস্ত। ওর নাম রামনারায়ণ তিওয়ারি। ওকে বলেছি আমাদের সব কথা।'

তীব্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষলেন রতিকান্ত। সাধে এই দেশের খোঁচড়গুলোকে বাঁদরের বাচ্চা বলে ডাকেন না তিনি। কথা ছিল যে গঙ্গাপদ আর তিনি, এই দুজনেই যাবেন ঘুঘুডাঙার জমিদারবাড়ির শিবমন্দিরে। এ যে কত বড় ঝুঁকির কাজ সে ব্যাপারে রতিকান্ত বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল আছেন। মন্ত্রগুপ্তি হচ্ছে এসব কাজের প্রধান উপকরণ। ভগবানের অলঙ্কার চুরি করতে এসেছে, এই খবর চাউর হয়ে গেলে রতিকান্ত মল্লিকের পিঠের একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না।

'তোমার সঙ্গে তো অন্য কারও আসার কথা ছিল না গঙ্গা,' ধারালো শোনালো রতিকান্ত'র গলার স্বর, 'তাহলে তোমার বন্ধুকে এখানে আনার মানে কী?'

একটু অস্বস্তির হাসি হাসল গঙ্গাপদ, 'আসলে কী হয়েছে সাহেব, রামুকে না বলেন আমি কোনও কাজ করি না, বুঝলেন। আপনি যখন আমাকে কাজের কথাটা বললেন না, সেটাও না না করে রামুকে বলে ফেলেছি। এখন ও চাইছে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে।'

'তাতে আমার লাভ?' অন্ধকারে হিসহিসে শোনায় রতিকান্ত'র কণ্ঠস্বর।

খুকখুক করে হাসে রামনারায়ণ, 'লাভ আছে সাহেব। নইলে আমি কী আর এমনি এসেছি?'

'বটে? আর তোমার লাভ?'

ফের সেই খুকখুকে হাসি, 'গঙ্গাপদকে যা দিচ্ছেন তাই দেবেন সাহেব। রামনারায়ণ তেওয়ারি নিজের ন্যায্য পাওনার থেকে একটা টাকাও বেশি নেয় না, ঘুঘুডাঙার সব্বাই জানে।'

রতিকান্ত বুঝতে পারলেন এই ছেলে গঙ্গাপদ'র তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। কথাবার্তায় ধূর্তামির ছাপ স্পষ্ট।

'তাহলে বলো রামনারায়ণ, কীভাবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো?'

'মিত্তিরদের জমিদাবাড়ির চৌহদ্দিতে কীভাবে ঢুকবেন সেটা ঠিক করেছেন কিছু?'

'কী মনে হয়? আমি আজ পায়চারি করতে করতে ভাবলাম অ্যাদ্দূর চলেই যখন এসেছি তাহলে জিনিসটা চুরি করে নিয়ে গেলে ভালো হয়। তাই না?'

গম্ভীর হয়ে গেল রামনারায়ণ,'আপনার পরিকল্পনা আমি শুনেছি সাহেব। কিন্তু আমার কাছে তার থেকেও অনেক ভালো রাস্তা আছে। ঝুঁকিও কম, আর ফরাসডাঙ্গায় পৌঁছবেনও অনেক তাড়াতাড়ি।'

'কীরকম?'

নিজের পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করে রামনারায়ণ। স্থির হয়ে শুনতে থাকেন রতিকান্ত।

আজ থেকে দেড় বছর আগে। লখনৌ। ডিসেম্বর মাস।

ফয়্যার প্লেসের আগুনটা একটু উসকে দিয়ে রকিং চেয়ারে এসে বসলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে দামি সিল্কের গাউন, হাঁটু অবধি ফুল মোজা। ফর্সা রং, কাঁচা পাকা চুল, আর সোনালি রিমের চশমায় ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আলাদা আভিজাত্য ফুটে উঠেছে। শুধু চেহারায় কেন, ঘরের সর্বত্র বৈভব আর আভিজাত্যের পরিচয়। মেঝেতে পাতা দামি কার্পেটে, বাহারী ওয়ালপেপারে, দেওয়ালে ঝোলানো দামি পেইন্টিং-এর দিকে তাকালে বোঝা যায় গৃহস্বামীর অর্থও আছে, রুচিও। একদিকের দেওয়াল জুড়ে দামি ওক কাঠের বুককেস। তাতে ঠাসা বইপত্র।

ঠোঁটে ধরা পাইপটা নিভে গেছিল। তাতে লাইটার জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করতে করতে উলটোদিকে বসা লোকটিকে একবার আড়চোখে দেখে নিলেন তিনি। তারপর একবার খাঁকার দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে তো চিনলাম না।'

লোকটি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। প্রশ্ন শুনে চমকে সামনে তাকাল সে। তারপর খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, 'সে নিয়ে বিশেষ উতলা হবেন না প্রফেসর গুপ্তা। আমাদের পরস্পরকে চেনার সম্ভাবনা এতটাই কম যে রীতিমতো প্রব্যাবিলিটির অঙ্ক কষে দেখতে হবে। আমাকে না চেনার জন্য আপনার লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

ভুরু কুঁচকোলেন গৃহকর্তা। প্রথমে দেখে যতটা বোকাসোকা মনে হয়েছিল, লোকটি হয়তো ততটা নিরীহ নয়। উত্তর দেওয়ার ধরনের মধ্যে একটা শান্ত আত্মবিশ্বাস আছে, যেটা চট করে সাধারণ লোকের মধ্যে আসে না। এবার বুঝলেন তিনি, কেন তাঁর ড্রাইভার কাম কম্বাইন্ড হ্যান্ড লছমন লোকটাকে আটকায়নি।

পাইপ খেতে খেতে আগত আগন্তুককে একবার আগাপাশতলা দেখে নিলেন কিংস জর্জ কলেজের সদ্য প্রাক্তন অধ্যাপক রামশরণ গুপ্তা। বোঝাই যায় যে লোকটি উত্তর ভারতের লোক নয়। উচ্চারণ শুনে রামশরণ অনুমান করে নিলেন,লোকটি খুব সম্ভবত বাঙালি।

আরও মনোযোগ সহকারে এই আগন্তুককে লক্ষ্য করা শুরু করলেন প্রফেসর গুপ্তা। লোকটার ব্যবহারে কিন্তু কোথাও কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। পোশাক আশাক দেখে মনে হয় লোকটি স্বচ্ছল না হলেও দরিদ্র নয়। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল লোকটির চোখদুটি, বুদ্ধিতে আর কৌতুকে ঝকঝক করছে। তার ওপর চওড়া কপাল, টিকলো নাক, আর সরু করে কাটা গোঁফ দেখলে বোঝা যায় যে লোকটি খুব সাধারণ ঘরের কেউ না।

রামশরণ পাইপে একটা টান দিয়ে বলেন, 'প্রথম আলাপে নিজের পরিচয় দেওয়াটাই ভদ্রতা বলে জানতাম।'

লোকটি বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বললো, 'এই না-চীজের গুস্তাখি মাফ করবেন স্যার। কী আর করা যাবে বলুন, আমি আবার লখনৌভি তেহজিবটা এখনও ঠিক শিখে উঠতে পারিনি। এই বদনসিবের নাম নাম ব্রজনারায়ণ মিত্র।'

'কলকাতার লোক নাকি প্রবাসী বাঙালি?'

'প্রশ্নটা কি খুব বুদ্ধিমানের মতো হল প্রফেসর সাহেব? কলকাতার বাইরে বাকি বেঙ্গলে কি বাঙালি থাকে না? নাকি তারা সবাই প্রবাসী? আপনার মতো বুজুর্গ জানকার লোক যদি ব্যাপারটা খেয়াল না করেন, তবে আমাদের মতো জাহিল, আনপঢ়, বে-ইলম কোথায় যাই বলুন তো?'

ভুরু কুঁচকোলেন প্রফেসর গুপ্তা'তা মিস্টার মিত্র, হঠাৎ করে আমার বাড়িতে হানা দেওয়ার কোনও কারণ? ভাষা শুনে তো মনে হচ্ছে যে বাঙালি হলেও এদেশে কম দিন হয়নি আছেন। লখনৌভি তেহজিবের কথা যখন উল্লেখ করলেনই, তখন এ শহরের সামাজিক রীতিনীতি আদবকায়দাও আপনার জানা উচিত। আশা করি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে...'

হাত জোড় করে প্রফেসর গুপ্তাকে থামিয়ে দিলেন ব্রজনারায়ণ মিত্র। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে এদেশের আদবকায়দা কিন্তু কিছু কিছু শিখেছি প্রফেসর। আপনাকে খুঁজে বার করতো তো কম ধকল যায়নি আমার, তাও ধরুন প্রায় বছর পাঁচেকের পরিশ্রম। তা এই ক'বছরে প্রবাদপ্রতিম লখনৌভি ভদ্রতার কিছু তো অন্তত শিখব না, তা কি হয়?'

পাইপে টান দিয়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক। লোকটার এই আপাতকৌতুকতার মধ্যে একটা শীতল ক্রুরতা আছে যেটা তাঁর কাছে একটু অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল।

'ওয়েল মিস্টার মিত্র। আপনি বেঙ্গলর লোক, অনেকদিন ধরে আমাকে খুঁজছেন, টু বি প্রিসাইজ প্রায় বছর পাঁচেক ধরে, এসবই বুঝলাম। এবার আপনার আসার কারণটা একটু জানাবেন দয়া করে? বোঝেনই তো, আমার সময়ের দাম আছে। বেকার গালগল্প করার মতো সময় আমার কাছে একদমই নেই।'

হেঁ হেঁ করতে করতে আগন্তুক লোকটি বললো, 'সে তো বটেই, সে তো বটেই। আপনি ব্যস্ত লোক, লখনৌ শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রিয়ও বটে। আপনার কাছে বসে দু-দণ্ড খোশগল্প করতে

পারাও যে অনেক পুণ্যের ব্যাপার সেটা কি আর জানি না?'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রফেসর গুপ্তার, 'সেক্ষেত্রে আপনার কী বক্তব্য সেটা সাফ সাফ বলে ফেলে কেটে পড়ুন মিস্টার মিত্র। আমার সময়ের দাম আছে।'

লোকটা কোমরে হাত দিয়ে ধীরেসুস্থে একটা ওয়েবলি স্কট বার করে আনলো। তারপর সেটা সামনের টেবিলে রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো, 'দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিজের দেশ ছেড়ে গোটা উত্তর ভারত জুড়ে রতিকান্ত মল্লিকের উত্তরাধিকারীদের খুঁজে চলেছি প্রফেসর রামশরণ গুপ্তা। সময়ের দাম আমারও আছে বইকি। রতিকান্ত মল্লিকের সঙ্গে ঘুঘুডাঙার মিত্র পরিবারের একটা পুরোনো হিসেব মেটানো এখনও বাকি, সেটা জানেন তো? সেটা না মিটিয়ে এত সহজে কী করে কেটে পড়ি বলুন দেখি?'

প্রফেসর গুপ্তার মুখ আরক্তভাব ধারণ করল, 'ইউ ব্লাডি সোয়াইন। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? জানো আমি কী করতে পারি?' বলেই উচ্চৈস্বরে ডেকে ওঠেন তিনি, 'লছমন, লছমন, কাঁহা মর গ্যায়ে হো? তুম রেহতে হুয়ে ইসবদতমিজ বঙ্গালিকো ঘরমে ঘুসনেকা হিম্মত ক্যায়সে হুয়া?'

লছমনকে টেনে নিয়ে আসে একটা লোক। তার হাতে ছুরি, লছমনর গলায় ধরা। তার সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে আরও দুটো লোক, তাদের হাতে পিস্তল।

লোকটা এবার সামনে ঝুঁকে আসে, সামান্য লাজুকস্বরে বলে 'এই বদতমিজ বঙ্গালি আপাতত আপনার পুরো বাড়ির দখল নিয়ে নিয়েছে প্রফেসর গুপ্তা। খাঁটি লখনৌভি বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে রাখি, বিন্দুমাত্র বেচাল কিন্তু বরদাস্ত করা হবে না।'

নার্ভাস হয়ে পড়েন প্রফেসর গুপ্তা। গোলাগুলি অস্ত্রপাতি দেখলেই নার্ভাস হয়ে পড়েন তিনি। তবু তার মধ্যেই তোতলাতে তোতলাতে বলেন, 'তু তু তুমি কী ভেবেছ, আমাদের এখানে খুন করে চলে যাবে আর পুলিশ কিছু বুঝবে না?

লোকটা মিষ্টি হেসে বলে, 'পুলিশ কী বুঝবে সে কথা পরে ভাববেন প্রফেসর সাহেব। কিন্তু তার আগে আপনি নিজের পরিস্থিতিটা একটু বুঝেশুনে দেখলে ভালো হত না?'

'কী চাই তোমার?'কপালে ঘাম জমতে থাকে প্রফেসর গুপ্তার।

'এই তো, এবার কাজের কথায় এসেছেন।' লোকটা ভারী খুশি হয়, 'এবার বলুন দেখি ওই সোনার পাত দুটো কই?

'কোন সোনার পাত?'

লোকটা এবার ওয়েবলি স্কটটা তুলে নিয়ে প্রফেসর রামশরণ গুপ্তার কপালের মধ্যিখানে ঠেকায়। তার স্বরে এখন পরিহাস বা বিনয়ের বাষ্পমাত্র নেই। কঠিন গলায় বলে, 'যেটা আপনার পূর্বপুরুষ মিস্টার রতিকান্ত মল্লিক আজ থেকে একশো তিরিশ বছর আগে বেঙ্গল থেকে চুরি করে নিয়ে আসেন। ঘুঘুডাঙার রাজবাড়ির শিবলিঙ্গ থেকে খুলে আনা সোনার ত্রিপুণ্ড্রক।'

বিজয়া দশমীর রাত, আঠেরোশো নব্বই সাল, ঘুঘুডাঙা।

তিনজনে যখন পাঁচিল টপকে জমিদারবাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকলেন তখন রাত্রি তিন প্রহর। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে দশমীর চাঁদ। সারা রাস্তা নির্জন, এমনকি গ্রামের কুকুরগুলো অবধি কোথায় ঘাপটি মেরেছে কে জানে।

ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল রতিকান্ত মল্লিকর। 'কী ব্যাপার, কুকুরগুলো ডাকছে না কেন?'

'যাতে না ডাকে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর রামনারায়ণের।

মন্দিরটা জমিদারবাড়ি পিছনবাগে। সেখান অবধি পৌঁছবার একটাই রাস্তা, মূল ফটক দিয়ে ঢুকে দুদিকে দুটো ছোট গলি, যেগুলো জমিদারবাড়ির মূল অংশটাকে বেড় দিয়ে পেছনের বাগানে গিয়ে পড়েছে। রতিকান্ত আর গঙ্গাপদ'র প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিলো সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি মূল ফটক দিয়ে ঢোকা। ফটকের চাবি গঙ্গাপদ'র কাছেই থাকে।

কিন্তু রামনারায়ণ বিলকুল উলটো পথ ধরল। সে জমিদারবাড়ির বাইরের মেঠো রাস্তা ধরে পৌঁছল একেবারে বাগানের পেছনবাগে। খুঁজেপেতে একটা মস্ত বটগাছের নীচে এসে দাঁড়াল সে। সেই রাস্তার একদিকে জমিদারবাড়ির পাঁচিল, অন্যদিকে মা গঙ্গা। রতিকান্ত যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ইটের ভাঙাচোরা সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার তীর অবধি। ঘাটে একটা ছোট নৌকো বাঁধা, এখান থেকেও সেটা নজর এড়াল না রতিকান্ত'র।

'এখান দিয়ে কেন? আমাদের কথা ছিল না মেইন গেট দিয়ে ঢোকার?' উষ্মা গোপন রাখেন না রতিকান্ত।

'আগেই বলেছি, পরিকল্পনাটা খুবই বোকার মতো হয়েছিল সাহেব। ধরুন কাজ শেষ হওয়ার আগে কোনওভাবে সবাই টের পেল যে মন্দিরে কেউ ঢুকেছে। তখন পালাতেন কোথা থেকে? সদর দরজাটাই তো সবার আগে বন্ধ হত, তাই না?'

চুপ করে রইলেন রতিকান্ত, কথাটায় যুক্তি আছে। ততক্ষণে বটগাছের গোড়ার দিকে একটু ঝুঁকে পাঁচিলের খানিকটা অংশ উন্মুক্ত করে রামনারায়ণ। সেখান দিয়ে একটা ফোকর উঁকি দিচ্ছে বটে।

'গ্রামের ছেলেরা দুষ্টুমি করে বাগান থেকে ফলপাকুড় পাড়বে বলে এই ফোকরটা বানিয়েছিল। এর খোঁজ গঙ্গাপদ তো রাখেই না, এমনকি বাগানের মালি রামখিলাওন অবধি রাখে না। আমি কী করে এর খোঁজ পেয়েছি সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে আপাতত এর মধ্যে দিয়ে ভিতরে আসুন দেখি। দেখবেন, আওয়াজ যেন না হয়।'

রতিকান্ত সেই ফোকর দিয়ে ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘাটে নৌকোটা বাঁধা আছে দেখেছি। চালাবার লোক আছে তো?'

রামনারায়ণ বাঁকা হেসে বলল, 'রামনারায়ণ তেওয়ারি আধা কাজ করে না সাহেব।'

আজ থেকে দেড় বছর আগে। লখনউ। ডিসেম্বর মাস।

প্রফেসর গুপ্তা মৃদুস্বরে কথা বলা শুরু করেন। মনে হয় ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকা থমথমে নৈঃশব্দের মধ্যে কে যেন গ্রামোফোনের পিন দিয়ে আঁচড় কেটে চলেছে।

'তুমি যখন ওই সোনার ত্রিপুণ্ড্রকের কথা জেনে গেছ, তখন পুরো ঘটনাটাই জানো নিশ্চয়ই।'

'নট নেসেসারিলি প্রফেসর গুপ্তা' রিভলভারটা নিজের হাতে ধরে কৌচে বেশ আয়েশ করে বসে লোকটা, 'চুরি করা অবধি জানি। তারপর বাকিটা জানি না।'

'এ গল্প আমাদের পরিবারে বহুদিন ধরে প্রচলিত, যাকে বলে ফ্যামিলি ফোকলোর বলে, তাই।'

ঘুঘুডাঙার রাজবাড়ি থেকে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসার পর রতিকান্ত আর বেঙ্গল প্রভিন্সের ধারে কাছে থাকেননি। সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন কানপুরে। দেশে ফিরেই কোন যাদুমন্ত্রে বিরাট ধনী হয়ে পড়েন তিনি। বিয়ে করেন এক স্থানীয় জমিদারের কন্যাকে। তিনি ধনী তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে তাঁর বংশ মর্যাদাও কম বড় ছিল না। তাই এই বিয়েতে কোনও পক্ষের তরফেই কোনও আপত্তি ওঠেনি। একটা উড়ো খবর অবশ্য কন্যাপক্ষের কানে এসেছিল যে বাংলায় থাকাকালীন নাকি রতিকান্ত কোনও এক বাঙালি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তবে প্রথমত তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, আর দ্বিতীয়ত সে যুগে হিন্দু পুরুষদের পক্ষে একাধিক বিয়েতে কোনও আইনি বাধা ছিল না। ফলে কন্যাপক্ষ এ নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাননি।

রতিকান্ত আর বিন্দিয়া চৌধুরীর কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁদের একটি মেয়ে জন্মায়, রাগিণী, রাগিণী মল্লিক। ইনি বড় হয়ে বিয়ে করেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট রামলখন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে। রাগিণী বিয়ের পর তাঁর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাঙ্কও নিয়ে আসেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। লেডি রাগিণী ছাড়া সেসব দেখার অধিকার নাকি শ্রীবাস্তব পরিবারের আর কারও ছিল না।

রামলখন বিয়ের পর সামরিক বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে রাগিণীকে নিয়ে পাড়ি দেন শ্রীলঙ্কা। সেখানে চা-এর ব্যবসা করে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। শ্রীলঙ্কায় তাঁদের দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান জন্মায়।

মেয়েটি ছোট, নাম আরতি শ্রীবাস্তব। তিনি পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়।

আরতি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন, তখনই বাধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই সময়েই তিনি পরিচিত হন আরেকজন মেধাবী যুবকের সঙ্গে, রঘুনন্দন গুপ্তা।'

এই পর্যন্ত বলে মাথা নীচু করে চুপ করে থাকেন প্রফেসর রামশরণ গুপ্তা।

আগন্তুক বলে, 'আর আরতির সেই দুই ভাইয়ের নাম হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব আর চন্দ্রভানু শ্রীবাস্তব, দুজনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা যান, তাই তো?'

মাথা নাড়েন প্রফেসর গুপ্তা, 'ঠিক যেদিন দেশ স্বাধীন হয়, সেদিনই আরতি আর রঘুনন্দনের একটি ছেলে জন্ম নেয়, জানকীবল্লভ গুপ্তা। ইনি ছিলেন আর্কিওলজিস্ট। দেশ বিদেশের বহু পুরাতত্ত্ববিষয়ক অভিযানে ইনি অংশ নিয়েছেন। শেষ বয়সে এসে পদ্মভূষণ খেতাবও পান।

'আরতি শ্রীবাস্তব থেকে বাকি ইতিহাসটা আমি জানি প্রফেসর সাহেব। আপনার বাবা প্রফেসর জানকীবল্লভ গুপ্তা'র খ্যাতির ব্যাপারেও জানি। আপনার পড়াশোনা কলকাতায়, বিয়ে করেছিলেন এক বাঙালি মহিলাকে, একমাত্র ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, এসবও জানা আছে। শুধু রতিকান্ত থেকে আরতি অবধি পারিবারিক সূত্রটা খুঁজতেই আমার এতগুলো বছর কেটে গেল। সে যাই হোক, এবার কাজের কথায় আসুন প্রফেসর গুপ্তা। লেডি রাগিণীর সেই ট্রাঙ্কের কী হল?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লেডি প্রথমবারের জন্য রাগিণী শ্রীবাস্তব-এর ট্রাঙ্ক খোলা হয়। দেখা যায় যে তার মধ্যে প্রচুর প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু আর্টের নিদর্শন অত্যন্ত উঁচুদরের। এসবের সঙ্গে রতিকান্ত মল্লিকের একটা ডায়েরিও ছিল। সেই ডায়েরিতে কোন আইটেম কোথাকার, কী তার বিশেষত্ব, কোথা থেকে কীভাবে সংগৃহীত সেসবের বিস্তারিত বিবরণ ছিল।

ততদিনে রামলখনও মারা গেছেন। মারা গেছেন হরিশঙ্কর আর চন্দ্রভানুও। ফলে এসব এসবের ভার এসে পড়ে আরতিও ওপরেই।

আরতি ছিলেন ঘোরতর ভাবে একজন আধুনিক মনস্ক মানুষ। তিনি রতিকান্ত'র ডায়েরি পড়ে বুঝতে পারেন এসবই প্রাচ্যের বিভিন্ন সম্পদ, রতিকান্ত চুরি করে এনেছিলেন। যেগুলো রতিকান্ত কোনও কারণে হাতছাড়া করতে চাননি, সেগুলোই ওই ট্রাঙ্কে আছে। তিনি প্রতিটি আইটেম ধরে ধরে দেশের জিনিস দেশের সরকারের হাতে তুলে দেন। একটি জিনিস ছাড়া।'

আগন্তুক ঝুঁকে আসে, 'কী সেটা।'

'ঘুঘুডাঙার সেই সোনার ত্রিপুণ্ড্রক। তার ডায়েরি মোতাবেক তার তিনটি অংশ, কিন্তু রতিকান্ত দুটিই আনতে পেরেছিলেন। আরতি ভেবেছিলেন ওটা ফেরত দিতে গেলে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে তৃতীয়টা কোথায়। তাই আর সে নিয়ে এগোননি।'

লোকটা এবার চওড়া করে হাসে, 'আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস খুবই ইন্টারেস্টিং প্রফেসর গুপ্তা। একজন চুরি করেছেন, আরেকজন ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক, আলাপ করে ভালো লাগল। এবার ওই দুটো পার্ট দিন দেখি, আরতি ম্যাডামের শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করে দিয়ে যাই।'

প্রফেসর গুপ্তা কঠিনভাবে সামনে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনিই যে সেই জমিদারবাড়ির উত্তরাধিকারী তার প্রমাণ কী?'

বিজয়া দশমীর রাত, আঠারোশ নব্বই সাল, ঘুঘুডাঙা।

বিশাল শিবলিঙ্গটার দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে রইলেন রতিকান্ত।

মন্দিরের ভিতরে একটা ছোট জানলা, সেটা দরজার উলটোদিকের দেওয়ালে। তার ফাঁকফোকর দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল তাতে দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক, বরং অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে উচ্চতায় প্রায় আট থেকে দশ ফুট, কম করে হলেও দু-ফুট ব্যাসার্ধের শিবলিঙ্গটিকে বিশাল এবং

ভয়াবহ মনে হচ্ছিল রতিকান্ত'র। 'পেশা'-র সূত্রে এ দেশের বহু মন্দির ঘুরেছেন তিনি, কিন্তু এরকম বিশাল আকারের শিবলিঙ্গ কমই দেখেছেন।

অন্ধকারে রামনারায়ণের ফিসফিসানি কানে আসে, 'দেখেশুনে বাক্যি হরে গেল নাকি সাহেব?'

শুনে চটপট ধাতস্থ হন রতিকান্ত। অনেক কাজ বাকি, সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তিনি ফিসফিস করে শুধোন, 'গঙ্গাপদ, রামনারায়ণ, বাকি ব্যবস্থা কই?'

বাঁশের তৈরি একটা উঁচু মতো মাচা এনে দিল রামনারায়ণ, আস্তে আস্তে বলল, 'গঙ্গাপদ দরজা পাহারা দিচ্ছে সাহেব। আপনি যা করার করুন। দেখবেন যেন শব্দ না হয়।'

মাচাটাকে খুব সন্তর্পণে টেনে এনে, শিবলিঙ্গের যে অংশটাকে গৌরীপট্ট বলে, তার পাশে রেখে মাচাটার ওপর চড়লেন রতিকান্ত। বাঁশের মাচা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠলো। রতিকান্ত বুঝলেন যে বস্তুটি খুব একটা মজবুত নয়। তবুও তার মধ্যেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবার আড়চোখে দরজার দিকে তাকালেন রতিকান্ত। গঙ্গাপদ'র আবছায়া অবয়বটা দেখা গেল সেখানে। মনে মনে তাকে একটা ধন্যবাদ দিলেন তিনি। ছোঁড়া এমনি কাজেকর্মে ঢ্যাঁড়স হলে কী হবে, তালা খোলায় ওস্তাদ একেবারে। সেই সুনাম শুনেই তো বিস্তর টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে ছেলেটাকে টেনেছিলেন তিনি। তাঁর সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে একটু আগেই। মন্দিরের অত বড় ভারী তালা যে স্রেফ একটা এক আঙুল লম্বা লোহার কাঠি দিয়ে খুলে ফেলা যায়, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না চৌরশ্রেষ্ঠ রতিকান্ত মল্লিকের।

এবার সোজা হয়ে সামনে তাকালেন রতিকান্ত। তাঁর সামনে এখন শিবলিঙ্গের মাথার কাছটা। আর সেখানে আনুভূমিকভাবে পরপর সাঁটা আছে তিনটে সোনার পাত। ঘুঘুডাঙার জমিদারবাড়ির বিখ্যাত সোনার ত্রিপুণ্ড্রক। প্রতি পাতের আকার দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, অর্থাৎ এক ফুট আর উচ্চতায় ছয় ইঞ্চি। আর সেই তিনটে সোনার পাতের গায়ে জমে আছে প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো চন্দনলেপার মোটা পরত।

'রামনারায়ণ, আলো আন।'

একটা ক্ষীণ আলোর বৃত্ত জ্বলে উঠল মন্দিরের এক কোণে। তারপর রামনারায়ণ একটা ছোট মশাল বাঁশের ডগায় বেঁধে উঁচু করে ধরে তুলে ধরল।

পকেট থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বার করে আনলেন রতিকান্ত। এসব জিনিস সাধারণ বাজারে পাওয়া যায় না। নিজের কাজের জন্য চেনা মিস্ত্রিকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে থেকে একটা ছেনির মতো জিনিস বার করলেন রতিকান্ত, সেটা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে শক্ত চন্দনের পুরু স্তর খুঁড়ে খুঁড়ে সাফ করলেন। তারপর পকেটে রাখা একটুকরো পশমের কাপড় গঙ্গাপদকে দিলেন। বললেন মন্দিরের কোণায় রাখা গঙ্গাজলের কলসী থেকে জল নিয়ে ওটা ভিজিয়ে আনতে।

পাত তিনটের গায়ে ভেজা কাপড় দিয়ে একটু ঘষতেই ভুরুটা কুঁচকে গেল রতিকান্ত'র। সোনার পাতের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে খোদাই করা ওসব কী?

'আলোটা একটু তুলে ধর তো রামনারায়ণ।' চাপা উত্তেজনায় আদেশ করলেন রতিকান্ত।

আলোটা আরেকটু তুলে ধরল রামনারায়ণ, তার সঙ্গে চাপা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন সাহেব। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

রতিকান্ত একটু নড়ে উঠতেই মাচাটা ফের আওয়াজ করে উঠল, এবার একটু জোরেই। দাঁত চিপে গঙ্গাপদকে গাল দিলেন রতিকান্ত, ব্যাটাচ্ছেলেকে যদি একটা কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তালা খুলতে পারা ছাড়া হতচ্ছাড়াটার আর কোনও গুণই নেই। দেখেশুনে তিনি একটা রামছাগলকেই সঙ্গে নিয়েছিলেন বটে।

মশালের আলোয় সোনার ত্রিপুণ্ড্রক ঝলমল করে উঠল রতিকান্ত'র চোখের সামনে। তার সঙ্গে তার গায়ে আঁকা আঁকিবুঁকিগুলোও।

এসব কী? আরও ঝুঁকে এলেন রতিকান্ত।

প্রথম পাতে অজানা ভাষায় কিছু লেখা। অক্ষরগুলো সংস্কৃত নয়, ও ভাষাটা ভালোই জানেন রতিকান্ত। এঅন্য কোনও ভাষা।

দ্বিতীয় পাতে পরপর চারটে ছবি আঁকা। প্রথম ছবিতে একটা কারুকার্য করা দরজা। দ্বিতীয় ছবিতে সেই দরজার সামনে একটা মস্ত বড় চাবি, তার উচ্চতা প্রায় দরজার সমান। তৃতীয় ছবিতে আবার দরজার জায়গায় চাবির ছবি আঁকা, তার গায়ে দরজার কারুকার্যগুলোই। চতুর্থ ছবিতে একটা ঘড়া, তার গলা জড়িয়ে একটা সাপ।

তৃতীয় পাতটা ভালোভাবে দেখার আগেই রামনারায়ণ চাপা গলায় বলল, 'জলদি করুণ সাহেব। এবার কিন্তু সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তড়িঘড়ি করে পিঠে আঁটা ঝোলাটা থেকে যন্তরগুলো বার করলেন রতিকান্ত। প্রথম যৌবনে মধ্যভারতের একটা কুখ্যাত ডাকাত দলের সদস্য ছিলেন তিনি, তাদের ছত্রছায়ায় অনেক কিছুই শিখেছেন। এইসব যন্ত্রপাতিও সেই সময়েরই কালেকশন।

প্রথম পাতটা উপড়ে আনতে বেশ অসুবিধা হল রতিকান্ত'র। ঘাম ঝরতে লাগল কপাল বেয়ে। এদিকে মশাল উঁচু করে ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে রামনারায়ণের। তার জায়গায় এখন গঙ্গাপদ। সে ভীতস্বরে বলল, 'আর কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মমুহূর্ত শুরু হবে সাহেব। লোকজন জেগে ওঠা শুরু করবে, তাড়াতাড়ি করুন।'

দ্বিতীয় পাতটা তুলে আনতে আরও কষ্ট করতে হল রতিকান্তকে। এই আশ্বিনের রাতেও রীতিমতো ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে গেলেন তিনি। কবজি থেকে শুরু করে কাঁধের কাছটা টনটন করতে লাগল। তার মধ্যে বাঁশের মাচার ক্যাঁচক্যাঁচটা বেড়েই চলেছে। ভয় লাগছিল রতিকান্ত'র, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন তিনি।

প্রথম দুটো পাত খুলে পিঠের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার ঝোলায় সাবধানে রাখলেন রতিকান্ত। তারপর মনোনিবেশ করলেন একদম শেষের পাতে।

বাইরে থেকে রাতচরা পাখির টিরিরিরি আওয়াজ ভেসে আসছিল। এছাড়া চারিদিক শুনশান। গঙ্গার দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা ভেসে এল মন্দিরের মধ্যে।

তৃতীয় পাতটা সবে অর্ধেক তুলেছেন, এমন সময় চাপাস্বরে শশশশ করে আওয়াজ করল রামনারায়ণ। রতিকান্ত আর গঙ্গাপদ দুজনেই চমকে তাকালেন ওর দিকে। দাঁতে দাঁত চিপে রামনারায়ণ বলল, 'আলোটা নীচে কর গঙ্গা। জমিদারবাড়ির কোনও একটা ঘরে কেউ আলো জ্বেলেছে।'

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল রতিকান্ত'র। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গঙ্গাপদ মশালটা মন্দিরের এক কোণায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল। তার হাত কাঁপছে তখন।

স্থির চোখে খানিকক্ষণ জমিদারবাড়ির দিকে চেয়ে রইল রামনারায়ণ। তারপর বলল, 'ওরা বোধহয় কিছু টের পেয়েছে সাহেব। যা করার এক্ষুনি করুন, গতিক ভালো বুঝছি না।'

আধো অন্ধকারের মধ্যেই তৃতীয় পাতটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন রতিকান্ত। উদ্বেগে আর উত্তেজনা তাঁর হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। এদিকে রামনারায়ণ আরও ঘনঘন বলতে লাগল, 'তাড়াতাড়ি করুন সাহেব। ওরা বোধহয় কিছু টের পেয়েছে। এক এক করে সব ঘরে আলো জ্বলে উঠছে।'

তৃতীয় পাতের শেষের অংশটা তুলে ফেলতে ফেলতেই জমিদারবাড়ির দিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে ওখানে? বুড়োবাবার মন্দিরে কে ঢুকেছে? ওরে কে কোথায় আছিস, আলো জ্বাল...'

গঙ্গাপদ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'পালান সাহেব, পালান। ওরা এসে পড়লে পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না।'

দাঁতে দাঁত চিপে রতিকান্ত বললেন, 'আর একটুখানি।'

রামনারায়ণ এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সাহেব, এবার বেরোন। জমিদারবাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। মশাল নিয়ে ওরা এদিকেই আসছে।'

গঙ্গাপদ লাফ মেরে মন্দিরের বাইরে পড়েই দৌড় দিল। মশাল নিভে যাওয়াতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার মধ্যেই তৃতীয় পাতটা খুলে এল রতিকান্তর হাতে। কিন্তু তিনি ধরার আগেই সেটা ঝনঝন শব্দ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শিউরে উঠলেন রতিকান্ত, সর্বনাশ!

সেই ঝনঝনানির আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কারা, 'ওরে চোর ঢুকেছে বুড়োবাবার মন্দিরে, কে কোথায় আছিস, সদর দরজা বন্ধ কর... দেখিস হারামজাদা যেন পালাতে না পারে...'

মাচা থেকে একলাফে মাটিতে নামলেন রতিকান্ত। তারপর মাটিতে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন তৃতীয় পাতটা। চেঁচিয়ে উঠল রামনারায়ণ, 'ওটা আমার হাতে সাহেব, আর সময় নষ্ট করবেন না, জলদি পালান।'

মন্দির থেকে দুজনে বেরিয়ে সোজা দৌড় দিলেন পাঁচিলের ওই ফোকরের দিকে। ততক্ষণে জমিদারবাড়ি মশালের আলোয় আলোকময়। সেই সঙ্গে জেগে উঠেছে গ্রামের লোকজনও। সদর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের লোকজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে, ছুটে আসছে এদিকেই। চারিদিকে হইচই আর প্রবল হল্লা। তারই মধ্যে দুইজনে ফোকর গলে কাঁচা রাস্তায়। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন রতিকান্ত, 'গঙ্গাপদ কোথায়?'

হাঁফাতে হাঁফাতে রামনারায়ণ বলল, 'ওর চিন্তা ছাড়ুন সাহেব। আগে নিজের চিন্তা করুন।'

ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নৌকোয় পৌঁছতে যা দেরি। লাফিয়ে নৌকোয় উঠলেন রতিকান্ত। ততক্ষণে মশালের আলো আর লোকজনের হইহল্লা খুঁজে পেয়েছে তাঁদের পালাবার পথ। কে যে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই পথেই পালিয়েছে শয়তানগুলো। খুড়োমশাই, শিগগির এদিকে আসুন। মনে হচ্ছে খুব বেশিদূর যায়নি ওরা।'

মশালগুলো ঘাটের দিকে ধেয়ে আসতেই নৌকো ছেড়ে দিল। কী যেন একটা মনে পড়ে যেতে চেঁচিয়ে উঠলেন রতিকান্ত, 'তোমার হাতের ওই সোনার পাতটা দাও রামনারায়ণ।'

রামনারায়ণ কিছু বলার আগেই মশালগুলো এসে দাঁড়াল ঘাটের মাথায়। তারপর একের পর এক সড়কি ধেয়ে আসতে লাগল নৌকোর দিকে। রামনারায়ণ ঝাঁপ দিল গঙ্গার জলে। লোকজন চিনে ফেলার আগেই তাকে পালাতে হবে তাকে, কেউ দেখতে পেলেই সর্বনাশ।

নৌকোর পাটাতনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন রতিকান্ত। আফশোসে হাত কামড়াচ্ছিলেন তিনি। ইশ, আর পাঁচটা মিনিট যদি সময় পেতেন। ওই থার্ড পিসটা না পেলে এটা তিনি কোথাও বেচতেও পারবেন না যে!

* * *

'বেজাবাবু।'

'উঁ।'

'বলি ও বেজাবাবু।'

'বলে ফ্যাল লখাই। কান খোলাই আছে।

'বলি এ কোথায় এনে ফেললেন মশাই? এ যে ধুম অন্ধকার দেখছি।'

'দেখ লখাই, মেলা হাঁউমাউ না করে চেপে বোস দিকিন। এমন একটা ভাব করছিস যেন তুই কিচ্ছুটি দেখতে পাচ্ছিস না, আর আমিই প্যাটপ্যাট করে সব দিকে চক্ষু মেলে বসে আছি।'

'সেই থেকে তো চেপে বসেই আছি বেজাবাবু, উঠতে আর দেখলেন কই? বিষ্টুচরণের শাগরেদরা থাবড়ে এমন চেপেচুপে বসিয়ে দিয়ে গেছে যে এখন তুলতে গেলে ক্রেন ছাড়া উপায় কী?'

'তুলতে হবে? এখনও বলছিস তুলতে হবে? মানে ইতিমধ্যেই উঠে যাসনি বলছিস?'

'উঠে যাইনি বলতে? বলি চাদ্দিকে এমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, হাত পা কোথায় সেঁধিয়ে আছে কী ঠিক ঠাহর হচ্ছে না, এমন সময় এসব রসিকতা না করলেই নয়?'

'বাহ বাহ, এই তো রসিকতাটা বুঝে গেছিস দেখছি। হাজার হোক গগন মাস্টারের ছাত্তর, একেবারে আবোদা গোঁসাই তো নোস। আট ক্লাস অবধি তো পড়েই ফেলেছিলিস, তাই না রে লখাই?'

'হেঁ হেঁ হেঁ, ওই আর কী, সাড়ে সাত ধরতে পারেন। মানে হাফ ইয়ার্লির পর আরও মাসখানেক ছিলুম কি না। তারপরেই তো মাস্টারমশাই একদিন ডেকে বললেন, 'ওরে লখাই, মা সরস্বতীকে আর কষ্ট দিস নি বাপ। একে ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে, হার্টও দুর্বল। তার ওপর তোর হাফ ইয়ার্লির খাতাটা যদি উনি ভুল করে একবার দেখে ফেলেন, তাহলে কী হবে ভাবতেই শিউরে উঠছি রে লখাই। তখন কি আর ওঁকে বাঁচানো যাবে রে? বলি উনি মরলে বাকি ছেলেপুলেদের কী হবে সেটা ভেবে দেখেছিস একবার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গগনের মুখে সে গল্প শুনেছি। পরীক্ষার খাতায় হুমায়ুনকে হনুমান আর জোয়ান অফ আর্ককে জোয়ানের আরক লিখে এসেছিলিস। আর হাইদাসপিসের যুদ্ধ নিয়ে লিখেছিলিস যে যুদ্ধে হায়দারের পিসে শহীদ হন।'

'আরে সেই শুনেই তো হায়দার স্যার স্কুলের বেঞ্চিটা তুলে এমন তাড়া করলেন যে...যাগ্গে যাক, সে কথা বাদ দিন। ওঠাউঠির কথা কী বলছিলেন যেন?'

'বলি উঠে এসে নিজেকে একটু হালকা হালকা লাগছে না লখাই?'

'হে হে, সে আর বলতে। মনে হচ্ছে বয়েসটা এক ঝটকায় বিশ বচ্ছর কমে গেছে মশাই। এই একবার ইচ্ছে করছে মিত্তিরদের পুকুরে সাঁতার কেটে আসি, আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে পাকড়াশীদের মাঠে গিয়ে একটু ফুটবল পেটাই।'

'উঠে আসার ওইটাই তো সুবিধে লখাই। বডি ফডি এক্কেবারে ঝরঝরে হয়ে যায়। শুধু উঠে কোথায় এসেছি সেটা যদি একটু জানা যেত। আচ্ছা লখাই, জায়গাটা তোর কেমন একটু ছরকুটে লাগছে না রে? কেমন যেন ভিরকুট্টি মেরে আছে না?'

'লাগছেই তো। সেইটাই তো বলার চেষ্টা করছি তখন থেকে।'

'ছোটবেলায় একবার কোন একটা বইতে রৌরব না কুম্ভীপাকের ডেসক্রিপশন পড়েছিলুম, বুঝলি। সেও নাকি ভারী আচাভুয়া জায়গা। সেখানেও নাকি এইরকম চোখের ওপর আলকাতরা লেপা অন্ধকার। হাত পা ঠিক ঠাহর হয় না...'

'দেখুন বেজাবাবু, আপনার কথা শুনে এই পথে পা বাড়িয়েছি, এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। ওই কীসের পাক না রব কীসব নামটাম বললেন, ওখানে আসার কথাটা কিন্তু কড়ারে ছিল না মশাই!'

'আসতে কি আমিই চেয়েছিলাম রে লখাই?'

'আপনার কথাবার্তা কেমন যেন ব্যাঁকাপারা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেজাবাবু। নাহ, দুটো পয়সার লোভে আপনার সঙ্গে কাজকারবার করাই মহা গোখখুরি হয়েছে দেখছি। আমার টাকাপয়সা মিটিয়ে দিন বেজাবাবু, আমি চলে যাই।'

'হে হে হে... তুই কী আর ফিরে যাওয়ার অবস্থায় আছিস রে লখাই? কী ভাবছিস, এখান থেকে গলায় হ্যালোজেন ল্যাম্প ঝুলিয়ে তুই রাস্তা দেখতে দেখতে পৃথিবীতে ফিরে যাবি, আর তোর ওই অপোগণ্ড ভাইপো তাসা পার্টির ছ্যা যাঁ যাঁ লাগিয়ে তোকে ঘরে তুলে নেবে?'

'দেখুন বেজাবাবু, ভালো হচ্ছে না কিন্তু। ভজন মোটেই অপোগণ্ড নয়। শুধু মাথায় একটু বুদ্ধি কম, এই যা। কিন্তু আমাকে যে রাতদুপুর নাগাদ ডেকে আনলেন বিষ্টুচরণের সঙ্গে কীসব হুড়যুদ্ধ করতে হবে বলে, আর আমিও হাতের খেঁটোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটা ভজন দেখেছে। ঘরে না তুলে নেওয়ার কী আছে মশাই? আর তা ছাড়া ও বাড়ি কার, আমার না? আমার বাড়িতে আমাকেই ঢুকতে দেবে না মানে?'

'ওই জন্য বলেছিলাম ওরে লখাই, অত বড় বোমটা মুণ্ডু দিয়ে হেড দিতে যাসনি, ঘিলু চলকে যাবে। বলি অত বড় যে একখান যুদ্দু হল তুই বেড়াল না মুই বেড়াল করে, বিষ্টুচরণের লোকজন ল্যাজা সড়কি রামদা

আর হাতবোমা দিয়ে আমাদের সাবড়ে দিল, সেসব কী একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছিস রে লখাই? কিচ্ছুটি মনে নেই?'

'আমি কি বোমাটোমা গুলি-বন্দুকে ভয় টয় পাই নাকি? ছোঃ! লাঠি হাতে দাঁড়ালে লখাই সামন্ত'কে ভয় খায় না, এমন মানুষ এই ঘুঘুডাঙায় আছে নাকি? বলি বিষ্টুচরণ তো আমার কাছে এখনও হাজার দশেক টাকা পায়। তবু তাকে কখনও দেখেছেন আমার সঙ্গে মিঠে কথা ছাড়া গলা উঁচু করে কথা কইতে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বিষ্টু তো সেদিন সেই শোধটাই তো সেদিন নিয়ে গেল রে লখাই। এবার তোর ভিটেমাটিতে ও যদি ঘুঘু না চড়ায় তো আমার নামে কুকুর পুষিস তুই।'

'ইঃ, অত বড় সাহস হবে নাকি বিষ্টুচরণের? লাঠি মেরে মাথা ফাঁক করে দেব না?'

'হে হে হে। তুই কি ভেবেছিস, বিষ্টু ওর লোকজন নিয়ে তোর ওই ভাঙাচোরা বাড়িটা দখল করতে আসবে? তার আর দরকার হবে না রে লখাই, গিয়ে দেখ, তোর ভাইপো কাল সকালেই সটকে পড়ার প্ল্যান করছে।'

'সটকে পড়বে মানে?'

'মানে তাকে কয়েকদিন ধরেই বিষ্টু ভারী মিঠেকড়া করে ওই দশ হাজার টাকার কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে কি না। ছোকরা আর চাপটা নিতে পারছে না, বুঝলি। কাল ভোরেই সে বাড়িঘর ছেড়ে লম্বা দেবে বলে ভাবছে।'

'অ্যাঁ? সে কি! ভজনের এত বড় সাহস? হতচ্ছাড়াকে এই জন্যে কোলেপিঠে মানুষ করেছি? দাঁড়ান তো বেজাবাবু, ঝট করে ব্যাটার ঘাড় ধরে দুটো ধোবিপাট মেরে আসি।'

'ওরে লখাই, ওসব মারদাঙ্গার কথা এখন ভুলে যা। বরং পরকালের কথা ভাব। শুনেছি রৌরব আর কুম্ভীপাক, দুটোতেই বড় কষ্ট দেয়। সেখানে কি আর তোর ওই গা জোয়ারি কোনও কাজে লাগবে? আমার তো ঘোর সন্দেহ আছে।'

'এসব কী হচ্ছে বেজাবাবু? জানেন না, আমি ভূতে ভয় পাই? তার ওপর আমাকে এসব অসৈরণ কথাবার্তা বলে প্রাণের ভয় দেখানোটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'ওরে লখাই, তোকে এখন আমি প্রাণ, আমজাদ খান, অমরীশ পুরী কারও ভয়ই দেখাচ্ছি না বাপধন আমার। তা ছাড়া কথাটা কি জানিস? ভেবে দেখতে গেলে তোর পক্ষে এখন ভয় পাওয়াটা একদমই ভালো দেখায় না।'

'বেজাবাবু, আপনি কিন্তু ফের ভয় খাইয়ে দিচ্ছেন মাইরি! ও কী, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মনে হচ্ছে?'

'আর দীর্ঘশ্বাস। বিষ্টুচরণের কথায় ভুলে একটা বড় ভুল করে ফেলেছি রে লখাই। এই লাইনে এতদিনের পাকা খেলোয়াড় হয়ে কী করে যে এত বড় ভুলটা করলাম, সে আক্ষেপ আমার আর যাওয়ার নয়।'

'কী কথা বেজাবাবু?'

'বলব রে লখাই। সব খুলে বলতেই হবে তোকে। কারণ ডায়েরিটা যদি ওই বিষ্টুচরণের হাত থেকে বাঁচাতে হয় তবে তোর ওই অপোগণ্ড ভাইপোটাই যা ভরসা।

'দেখুন বেজাবাবু, বার বার ভজনকে অপোগণ্ড বলে খামোখা ইনসালটিং করবেন না কিন্তু। একটু ঠান্ডা বটে, আর মাথাটা একটু নরম মতন হলে কী হবে, অমন হিরের টুকরো ছেলে কিন্তু আশেপাশের সাত গাঁ খুঁজলেও পাবেন না।'

'হলেই ভালো। এখন ডায়েরিটা যদি ঠিকঠাক করে উদ্ধার করে... ও কী লখাই? চাদ্দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কী দেখছিস অতো?

'ও ও ওরা কারা বেজাবাবু? গাছের ডাল থেকে সারি সারি দেহ ঝুলছে.. কাদের দেহ? আশেপাশেও ছায়ার মতো কারা যেন ঘুরছে... ও কাদের ছায়া বেজাবাবু? ওরা আপনার ওই বিষ্টুচরণের লোক নয় তো?'

'ঠান্ডা হয়ে চেপেচুপে বোস লখাই। এই ডালটার দুপাশে পা ঝুলিয়ে থেবড়ে বোস দিকি। ওরকম শান্তিগোপাল মার্কা গলা কাঁপানোর কিচ্ছু হয়নি। ওরা আমাদের মতোই প্রাক্তন হিউম্যান আর হিউওয়োম্যান বিইং। আচ্ছা ইংরেজিটা কি ঠিক বল্লুম রে লখাই? আমার ইংরেজিটা আবার মাঝেমধ্যেই... ও তুই তো আবার সাড়ে সাত পাশ।'

'ও বেজাবাবু... এসব কী বলছেন মশাই? এসবের মানে কী? তার মানে কী আমরা এখন...'

'হ্যাঁ রে লখাই, তুই যা ভাবছিস ঠিক তাই। আমরা আর বেঁচে নেই। আমরা এখন ভূত।'

* * *

আজকাল ঘুঘুডাঙার চণ্ডীমণ্ডপ বসছে সতীশ চাকলাদারের দাঁতের ডাক্তারখানায়। ডাক্তারখানাও নতুন, ডাক্তারবাবু সতীশ চাকলাদারও তাই। ইনি আগে পশ্চিমের কোন শহরে প্র্যাকটিস করতেন, ভাষায় একটা পশ্চিমা টান আছে। পসার মন্দ ছিল না। তবে আজকাল বেশি রুগী সামলাবার ধকল নিতে পারেন না বলে হপ্তা দুয়েক হল দেশে ফিরে এই জয়চণ্ডীতলায় এসে চেম্বার খুলেছেন। এখানেই একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। একাই থাকেন, স্বপাক রান্না করে খান। ফাইফরমাশ খাটার জন্য একটা ছোকরা চাকর রেখেছেন। তা এখানে আসার পর থেকে টুকটাক করে রোগী হচ্ছে মন্দ না।

সেপ্টেম্বরের শেষ, সবে মহালয়া গেছে। সন্ধের বাতাসে একটু শীত শীত ভাব, তার ওপর একটু আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই রাস্তায় আজ লোকজন নেই বললেই চলে। আড্ডাটা চলছিলো ভূত নিয়ে। বিশু গুছাইত বেশ জাঁক করেই বলছিল, 'বুঝলেন নগেনদা, ঝট করে ভূতে বিশ্বাস নেই বললেই ভূত জিনিসটা নেই হয়ে যায় না। ভূত জিনিসটা যে খাঁটি সত্যি, তার বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে।'

বিশু সদ্য পঞ্চায়েত বোর্ডের মেম্বার হয়েছে, এই চত্বরে তার দাপট খুব, চট করে তার কথা কেউ কাটে না। তবে গগন মল্লিকের কথা আলাদা। একে তিনি বিরোধী পার্টির লোক, তার ওপর ঘোরতর নাস্তিক। তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ভূতের নাকি আবার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, হুঁ! কঙ্কালের নাকি গেঁটেবাত, লুঙ্গির আবার হিপপকেট! বলি গাঁজাটা কী আজকাল একটু বেশিই হচ্ছে হে বিশু?'

বিশু একটু সিঁটিয়ে গেল। বদমেজাজী বলে ঘুঘুডাঙায় গগন মল্লিকের বিস্তর দুর্নাম আছে। ঘুঘুডাঙার রেসিডেন্ট ধোপা রামভজন গোয়ালার পেয়ারের মুলতানী গাই হচ্ছে রাজলক্ষ্মী। তাকে ঘুঘুডাঙার বাসিন্দা বিহারীদের মেয়ে-বউ'রা একেবারে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে সেবা করে। পালা করে এসে রাজলক্ষ্মীর পা টিপে দেয়, ক্ষুরে গঙ্গাজল ঢেলে পুজো টুজোও করে যায়। এহেন রাজলক্ষ্মী গেলবার ভোটের আগে গগন মল্লিকের সাধের ভাগলপুরী লুঙ্গি খেয়ে নিয়েছিলো বলে তিনি রাজলক্ষ্মী আর রামভজন দুজনকেই দরজার বাটাম খুলে তাড়া করে স্টেশনের পাশের পচা ডোবাটায় ফেলে দিয়েছিলেন। অবশ্য তারপরেই ভোটে হেরে যান। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র দমেননি তিনি। গগন মল্লিক সৎ একরোখা লোক, কাউকে ডরান না, বুক চিতিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন।

এই এলাকার বাঁধা পুরোহিত হলেন নরহরি চক্কোত্তি। তিনি কানে একটা দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নিমীলিত নয়নে বললেন 'ভূতের তুমি কী জানো হে গগন? ওসব দেখার জন্য অন্তর্দৃষ্টি চাই হে, বুঝলে হে, অন্তর্দৃষ্টি। খেচরী মুদ্রায় কুম্ভক সাধন করতে হয়। ইড়া আর পিঙ্গলা দুটোকেই টক করে মূলাধার থেকে সহস্রারে তুলে ফেলো দিকি। তাহলেই দেখবে চোখের সামনে ভূত আর ভগবান দুটোই দিব্যি প্রতীয়মান হচ্ছে।'

রোষকষায়িত লোচনে খানিকক্ষণ নরহরির দিকে চেয়ে রইলেন গগন মল্লিক। তারপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি হেনে বললেন, 'সারাটা জীবন তো অং বং চং করে আর লোকের মাথায় টুপি দিয়ে কাটালে নাড়ু। আমার না হয় পরকালের ভয় নেই, ওসবে বিশ্বাস করি না। বলি তোমার তো অন্তত সে ভয়টা আছে, তিনকাল গিয়ে তো এককালে ঠেকেছে। অন্তত এবার তো শুধরে যাও!'।

নরহরি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'একটা পাষণ্ড নাস্তিকের কাছ থেকে পরকালের কথা শুনতে হবে নাকি গগন? তুমি একে নাস্তিক, তার ওপর দেবদ্বিজে মোটে ভক্তি নেই। বলি তোমার জন্য যে রৌরব নরকের আগুনে লোহার কড়া চাপিয়ে পিপে পিপে তেল ঢালা হচ্ছে, সে খবর রাখো?'



গগন মল্লিক খানিকক্ষণ মুখ ওপরে করে কান ফাটানো শব্দ করে হাসলেন। তারপর একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'ওহে জালিয়াতচন্দ্র, এমন সুখবরটা তোমার কানে পৌঁছে দিলো কে শুনি?'

নগেন মুহুরি মাঝবয়েসি লোক। জেলাসদরে কাজ করেন, ঠাকুর দেবতায় ভারী ভক্তি। তিনি হাত দুটো মাথায় তুলে প্রণাম ঠুকে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'অমন করে বলতে নেই মল্লিকমশাই। হাজার হোক উনি পুরুত মশাই, ওঁকে অমন করে গালমন্দ করাটা কি ঠিক? তা ছাড়া ভূত ভগবান নিয়ে শেকসপিয়ার কী একটা দামি কথা বলে গেছিলেন বলে শুনিচি না?'

নরহরি চক্কোত্তি সোজা হয়ে বসে আপাত গম্ভীরমুখে বললেন, 'খবরটা পাঁচকান করতে চাইনি গগন। কিন্তু ভাবলাম নরকের কথাটা শুনে তোমার মতো অবিবেকী পাষণ্ডের যদি কিছু চৈতন্য হয়। বলি গ্যাঁড়াপোতার সদগুরু আশ্রমে গত পরশু এক মহাপুরুষ এসেছেন, শ্রীশ্রী জগদানন্দস্বামী। নাম শুনেছ? সিদ্ধ পুরুষ হে, সিদ্ধ পুরুষ। খবরটা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।'।

গগন মল্লিক ব্যাঁকা হেসে বললেন, 'গাঁজাদানন্দস্বামী? ও বিশু, তোমার গাঁজার সাপ্লাই কি এই বাবাজীবনের আশ্রম থেকেই আসে নাকি হে।'

বিশু শুনেই একটা হেঁচকি তুলল। তারপর ত্রস্ত হয়ে বলল, 'কার নামে কী বলছেন গগনদা? উনি পরমসিদ্ধ পুরুষ, ত্রিকালদর্শী। আর ব্রহ্মতেজের তো কথাই নেই, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আশেপাশের এলাকার শ্রদ্ধালু লোকজন তো একদম ইয়ে হয়ে আছে।'

'শ্রদ্ধালু? এটা কী ধরনের আলু বিশু? জ্যোতি না চন্দ্রমুখী?'

'হেঁ হেঁ। এই জন্যেই তো দাদা আগের ইলেকশনটা গুবলেট করে বসলেন। বলি এসব করতে করতেই তো আপনারা আজকাল দেশীয় ব্রহ্মতেজালো ইসে গুলোর খোঁজই পাচ্ছেন না দাদা।'

'বটে? তা এই জগদানন্দবাবুর ব্রহ্মতেজের নমুনাটা শুনি একটু।'

'শুনবেন? তবে শুনুন। আমাকে দেখেই তো প্রভু গড়গড় করে আমার ভূত ভবিষ্যৎ সবই বলে দিলেন। স্কুল কলেজ, বিয়ে শাদি, পঞ্চায়েত ইলেকশন, এমনকি পাঁচ বছর বয়সে যে সান্নিপাতিক হয়ে মরতে বসেছিলাম সেটাও।'

'বাহ বাহ। তাহলে তো খুব গুণের লোক বলতে হবে। তা গত হপ্তায় যে ওই পরেশ সাধুখাঁ'র চালকলটা বেনামে কিনলে সেটা বলতে পেরেছেন তো? আর নতুন মোটরসাইকেল কেনার টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছো সেটা? তার সুলুক-সন্ধান কিছু দিলেন নাকি?'

বিশু গুছাইত আরও সেঁটে গেলো দেওয়ালের সঙ্গে। নরহরি চক্কোত্তি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বাপু হে, সবজায়গায় অত হোলসেল অশ্রদ্ধা ভালো না। ওতে পরমাত্মা কুপিত হন, পরকালের পথ রুদ্ধ হয়। তুমি জানো শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে প্রভুজি দেশের দশের কত কী উপকার করেছেন?'

গগন মল্লিক একটা ঘোঁৎ করলেন।

'বিশ্বাস হল না তো? তা তোমার মতো পাপীতাপী অবিশ্বাসীর বিশ্বাস হবে কেমন করে? তবে শোনো, যেমন ধরো সেই যে তিরাশিতে সেবার যখন ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল, তার পেছনে কি আমাদের প্রভুজির যোগবিভূতি একেবারে ছিল না ভেবেছ?'

গগন মল্লিক ভারী নিরীহস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা তোমার এই বাবাজির বয়েস কত নাড়ু?'

'তা গোটা চল্লিশ তো হবেই।'

গগন মল্লিক ফের একটা বিষাক্ত হাসি হেসে বললেন, 'এটা দু-হাজার বিশ সাল নাড়ু। উনিশশো তিরাশি মানে আজ থেকে সাঁইত্রিশ সাল আগের ঘটনা। তোমার গোঁ বাবাজির বয়েস যদি এখন পঞ্চাশ হয়ে থাকে তবে তখন তাঁর বয়েস ছিল তিন। তা ইনি কি একেবারে যোগবিভূতি নিয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ল্যান্ড করেছেন?'

জগদানন্দের অবতারত্ব নিয়ে নরহরি একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই নগেন মুহুরি স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু চক্কোত্তিদা, ক্রিকেট তো হল গিয়ে সায়েবসুবোদের খেলা। তাতে হুড়যুদ্ধ আছে, কোটপ্যান্ট আছে, হ্যামবেকন আছে, এমনকি ইংরিজি অবধি আছে। সেখানে আমাদের প্রভুজির লীলা কি তেমন ফুটবে?'

'কথাটা ঠিকই বলেছেন মুহুরিমশাই। তবে সেদিন যা ঘটেছিল সে অতি গুহ্য কথা, বুঝলেন কি না।'

'কী কথা নরহরিদা?' নগেন মুহুরি আরেকটু ঘেঁষে আসেন।

'সেসব কথা কি আর অবিশ্বাসীদের সামনে বলা ঠিক হবে হে নগেন? তারা হয়তো এসবকে ধোঁকা ভাঁওতাবাজি এসব বলে উড়িয়েই দেবে।' বলে গগন মল্লিকের দিকে একটা বাঁকা চাউনি নিক্ষেপ করেন নরহরি। ইঙ্গিত বুঝে গগন মল্লিক গম্ভীর মুখে একটু সরে বসেন, যদিও কান থাকে এদিকেই।

এবার বেশ উচ্চৈস্বরে ফিসফিস করে বলতে থাকেন নরহরি, যাতে কথাগুলো গগনের কানে যায় ঠিকই। বিশু আর নগেন মুহুরি আরও কাছে ঘেঁষে বসেন।

'খবরটা কিন্তু আপনারা বাইরে পাঁচকান করবেন না কাইন্ডলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। তিরাশি'র বিশ্বকাপের ফাইনালের দিন, বুঝলেন কি না, প্রভুজি তাঁর সাধনপীঠের ছাদে উঠেছিলেন অষ্টসিদ্ধি ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। তেজীয়ান লোক তো কম নন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অণিমা আর লঘিমা দুটো একসঙ্গে আয়ত্তে চলে এল। আর ব্যস, ভদ্রলোক নিজের অজানতেই হাফ মাইলটাক ওপরে ভেসে উঠলেন।'

'সে কী?' চাপাগলায় প্রশ্ন করে বিশু গুছাইত। তার স্বরে উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট।

'কিন্তু গোলমালটা বাধলো এর পরেই।'

'কীসের গোলমাল দাদা?' এবার নগেন মুহুরি।

গগন মল্লিকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলতে থাকেন নরহরি, 'ঠিক সেই সময়ই সাউথ চায়না সী থেকে হঠাৎ করে একটা দমকা হাওয়া ভেসে আসে, বুইলে। আর ব্যস, গোস্বামী মশাই বসন্তপুর থেকে ধাঁ করে লর্ডসের আকাশে। লঘিমাতে বডি হেবি হালকা হয়ে যায় কী না! তখন ভিভ রিচার্ডস বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে আমাদের বোলারদের। এমন সময় প্রভুজি লর্ডসের আকাশে ভেসে এলেন, আর ঠিক তক্ষুণি মদনলালের বলে ভিভ রিচার্ডস দিলো একটা লোপ্পাই ক্যাচ। প্রভুজি তখন মাঠের ওপরেই বায়ুভূত নিরালম্ব হয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বলটা আকাশে তাঁর বাঁ বগলের কাছে সুড়সুড়ি দিতে তিনি মশাটশা ভেবে, 'আহ জ্বালাতন করিসনি বাপু' বলে বলটাকে থাবড়ে দেন। নীচেই উলটোবাগে দৌড়ে আসছিলেন কপিলদেব। তিনি যাকে বলে খেলুড়ে লোক। বলটাকে কপাৎ করে ধরে ফেলতে তাঁর কোনও অসুবিধাই হয়নি। ব্যস, বাকিটা তো জানেনই!'

ফের আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা পিলে চমকানো হাসি হাসলেন গগন মল্লিক। তারপর বললেন, 'শোনো ডাক্তার শোনো। আহম্মকদের কাণ্ড শোনো।'

সতীশ চাকলাদার মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তিনি কম কথার মানুষ। দরকার না হলে মুখ খোলেন না। এতক্ষণ ধরে একটা মেডিক্যাল জার্নাল পড়ার চেষ্টা করছিলেন। যদি কান ছিল এদিকেই।

'নরহরিদা, আপনার এই বাবাজি এসেছেন কোথা থেকে?' এতক্ষণে মুখ খুললেন সতীশ ডাক্তার।

'কে জানে?' হাত উলটোলেন নরহরি চক্কোত্তি, 'আমার গুরুভাই হরেন মুখুজ্জেকে তো চেনেন। সে থাকে গ্যাঁড়াপোতাতেই। হপ্তাখানেক আগে হরেন কলকাতা গেসলো তার ভায়রাভাইয়ের বাড়ি, শালির ছেলেকে পুজোর জামাকাপড় দিতে। ফিরতে ফিরতে লেট হয়ে যায়। তারপর লাস্ট ট্রেন ধরে যখন গ্যাঁড়াপোতায় নামে তখন রাত প্রায় বারোটা। নেমে দেখে স্টেশনে গাড়িঘোড়া কিছুই নেই। স্টেশন থেকে তার বাড়ি বেশিদূর নয়। হরেন ভেবেছিল বাকি রাস্তাটা হেঁটেই মেরে দেবে। তা হাঁটতে হাঁটতে ডাইনিজলার মাঠ অবধি এসেছে, দেখে অশথতলার কাছে কে যেন আগুন জ্বেলে বসেছে।'

'রাম রাম রাম... অত রাতে ডাইনিজলা? আপনার গুরুভাইয়ের তো সাহস আছে নরহরিদা।' নগেন মুহুরী শিহরিত হন।

'সবই গুরুকৃপা হে নগেন, গুরুকৃপা। সে যাই হোক। হরেন গিয়ে দেখে সে এক মহা অসৈরণ ব্যাপার। ওই অত রাতে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে হোম করছেন। হরেন উপস্থিত হতেই বাজখাঁই গলায় বললেন, 'এসেছিস? আয় রে পাশবদ্ধজীব, আয়। কালই যোগনিদ্রায় মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বটে। মা বলছিলেন ''ওরে জগা, বহুদিন হল নররক্তের স্বাদ পাইনি। মাঝে তো মুখবদল করতেও তো মন চায়।'' ওরে জগন্ময়ীর ইচ্ছে কি মিছে হতে পারে রে পাগলা? এই দেখ, মহাবলি নিজেই পায়ে হেঁটে উপস্থিত। এদিকে তিথিও প্রশস্ত, শুক্লপক্ষের চতুর্থী। জবার মালা, খাঁড়া, রক্তচন্দন সব রেডি। যা বাবা, যা, ঝট করে ওই জলাটায় একটা ডুব দিয়ে তো দেখি, জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে তোকে আজই উদ্ধার করে দিয়ে যাই।'

'তারপর? হরেন মুখুজ্জে বলি হয়ে গেল?' বিশু গুছাইত দৃশ্যতই শিহরিত।

'হলে কি আর সে খবরটা পেতে না বিশু?' খুবই বিরক্ত হলেন নরহরি, 'হরেন যে বলি হয়েই যেত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি না যে ধার্মিক মানুষ, পাপাচারী নাস্তিক নয়। ব্যাপারস্যাপার দেখে তার হাত পা কাঁপছে তখন। তার মধ্যেই সাহস করে একেবারে কাটা কলাগাছের মতো বাবা'র পায়ে পড়ে গেল। তার বউ বাচ্চা আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, দু'দুটো এল আই সি পলিসি আছে,বাড়ির হোম লোনের ই এম আই আছে, শ্বশুর চোখ বুজলে মোটা টাকা আছে, সে কিছুতেই বলি হবে না। শেষে বাবা'র দয়া হতে তাকে তুলে ধরে কানের কাছে বগলামন্ত্র পড়ে বলেন, 'যা রে মায়াবদ্ধ জীব যা। মহামায়া সবার জ্ঞাননেত্রে মশারি টাঙিয়ে রেখেছেন কি না, তাই এ যাত্রা তোর মুক্তির সামনে মা একটা রেলগেট ফেলে দিলেন। যার যা কপাল। মায়ের ইচ্ছেয় তোকে ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু খবরদার, এদিকে আর আসবিনি। আমি চাই না সংসারী মানুষ এসে আমাকে বিরক্ত করুক।'

নগেন মুহুরী কপালে যুক্তকর ঠেকালেন, 'মা মাগো। তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক মা।'

'তবে হরেনও কি সোজা মানুষ হে নগেন। সে তো পরের দিন সকাল হতেই লোকজন নিয়ে ডাইনিজলার মাঠে গিয়ে হাজির। বাবাজী তখন প্রাতকৃত্যাদি সেরে হাতমুখ ধুয়ে যোগধ্যানে বসার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি তো লোকজন দেখে মহা খাপ্পা, হরেনকে এই মারেন কি সেই মারেন। তারপর লোকজন হাতে পায়ে ধরে ওঁকে সদগুরু আশ্রমে এনে তোলে। বাবাজি আপাতত সেখানেই আছেন বটে, তবে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, দেবীপক্ষ শুরু হয়েছে বলে রয়ে গেলেন। কালীপুজোর পরেই উনি আর নেই, নর্মদার তীরে ওঁর সাধনভজনের কোটা কমপ্লিট করতে ফিরে যাবেন।'

'তা এত কথা তুমি জানলে কি করে নাড়ু?' উঁচু গলায় প্রশ্ন করেন গগন মল্লিক।

'বললাম যে, হরেন মুখুজ্জে আমার গুরুভ্রাতা। সে তো প্রভুজিকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেই আমার কাছে এসে হাজির। আমি তো শুনেই দৌড়ে গেছি। তোমার মতো পাপীতাপীদের সংসর্গ করি, একটু পুণ্য সঞ্চয় না করলে কী করে চলে বলো? তা গিয়ে ব্যাপার স্যাপার দেখেশুনে তো আমি তো যাকে বলে মোহিত। আমাদের পোস্টমাস্টারকে চেনেন তো? পরেশ সাঁতরা। এককালের নামকরা নাস্তিক, ধম্ম কম্ম অজাত কুজাত এঁটোকাঁটা কিছুই মানতো না। গিয়ে দেখি সে তো দীক্ষা নেবে বলে প্রভুজি'র একেবারে পা জড়িয়ে বসে আছে, ছাড়ার নামই নেই। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, অনেক পুণ্য করলে তবেই এমন মহাপুরুষ কালেক্কে দেখা দেন ডাক্তারবাবু। তবে পাপীতাপী নাস্তিকদের অবশ্য এ কথা বিশ্বাস হবে না, সে বলাই বাহুল্য।'

গগন মল্লিক বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন। 'তোমাদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া আর ঘরে বসে তাস খেলে সময় নষ্ট করা একই ব্যাপার। ধুর ধুর। সন্ধেটাই মাটি।'

নরহরি চক্কোত্তি লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে ও গগন, চললে কোথায়? আমাকে ওই মোড়ের বটগাছটা অন্তত পার করিয়ে তো দাও। সেদিনই দু'দুখানা লোক খুন হয়ে গেল ওখানে...রাতের বেলা...রাম রাম।'

আড্ডা ভেঙে গেল। ফাঁকা চেম্বারে চিন্তিত মুখে বসে রইলেন সতীশ ডাক্তার। তারপর চেম্বার বন্ধ করে বাড়ির রাস্তা ধরলেন।

* * *

'তবে যাই বলুন বেজাবাবু, আমার কিন্তু একটু আনন্দই হচ্ছে, বুইলেন।'

'সে তো যেভাবে চনমনে হয়ে উঠেছিস তা দেখেই বুঝতে পারছি লখাই। তা এত আনন্দের কারণটা একটু বুঝিয়ে বলবি নাকি আমাকে?'

'বলছি বেজাবাবু, এবার ইস্কুলে টিস্কুলে আমাদের নিয়ে পড়াশোনা হবে, তাই না?'

'বটে? তা হঠাৎ এরকম মনে হল কেন তোর?'

'আমাদের পাশের পাড়ার বুঁচকি'র এবার এইট কেলাস হল যে! সেদিন শুনলাম ভজনকে বলছিল যে ওদের নাকি এবার ভৌতবিজ্ঞান টিজ্ঞান কীসব পড়াবে। ভৌতবিজ্ঞান মানে তো ভূতেদেরই বিজ্ঞান, নয়?'

'হুঁ।'

'ও কী বেজাবাবু, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?'

'শ্বাসের আর দোষ কী! আচ্ছা লখাই, মাঝেমধ্যে তোর নিজেকে একটু কেমন কেমন লাগে না?'

'লাগে তো! গগন মাস্টার তো একদিন বলেই ফেলেছিল, 'ওরে বেজা তোর মতন অদ্ভুত প্রতিভা ভূভারতে নেই। রামভজনের রাজলক্ষ্মীও যদি কোনওদিন ধাতুরূপ শব্দরূপ আওড়াতে থাকে তো আশ্চর্য হব না। কিন্তু তোর মতো প্রতিভাকে লেখাপড়া শেখানো আর মাথা দিয়ে পাথর ভাঙা একই কাজ। কথাটা তো প্রশংসার মতোই মনে হল আমার, ঠিক কি না?'

'সাড়ে সাত? ঠিক বলেছিলি তো লখাই?'

'আহা, ওই আর কী। মানে হাফ ইয়ার্লির পর আরও মাসখানেক ছিলুম কি না। হরেদরে ওই সোয়া সাতই ধরুন না কেন। কিন্তু কথাটা কেমন যেন খোঁটা দেওয়ার মতো শোনাচ্ছে বলুন তো বেজাবাবু?'

'আহা, আবার খোঁটার কথা উঠছে কেন। তুই তো সংসারের খোঁটাখুঁটির বাঁধন ছিঁড়ে একপ্রকার উদ্ধারই হয়ে গেছিস বাপ আমার।'

'দেখুন বেজাবাবু, জানি যে এই ঘুঘুডাঙার দশ মাইল দূর দূর অবধি আপনার মতো পণ্ডিত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। তাই বলে কি আমাকে এত হেলাচ্ছেদ্দা করাটা ঠিক হচ্ছে?'

'আহা, এই তোর এক দোষ লখাই, বড় চট করে মাথা গরম করে ফেলিস। ওরে তোকে কি সে কথা বলেছি আমি? বলি শাস্ত্রে ব্যজস্তুতি বলে একটা কথা আছে জানিস তো? ওর মানে হচ্ছে নিন্দের ছলে প্রশংসা করা। ধরে নে আমি তো প্রশংসাই করলুম না হয়।'

'তা হঠাৎ করে আমার এত প্রশংসা করার বাই উঠল কেন শুনি?'

'এই দেখ, ছেলে এখনও চটে আছে আমার ওপর। বলি এই বয়সে এত রাগ করলে যে সান্নিপাতিক কি সর্দিগরমি হয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবি দেখছি।'

'হ্যা হ্যা হ্যা। ভূতের আবার সান্নিপাতিক আর সর্দিগরমি। বলি লোকে তো সর্দি হলে খোনা গলায় কথা কয় দেখেছি। তা ভূতের সর্দি হলে কি ভূতে মহালয়ার সকালে রেডিওবাবুর মতো মন্তর আওড়াবে বেজাবাবু?'

'এই তো ফের চনমনে হয়ে উঠেছিস দেখছি। সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার। শোন লখাই, এখন নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করে লাভ নেই। নিজেদের গোখখুরির দণ্ড তো দিয়েইছি। কিন্তু তাই বলে যার জন্য এত হুজ্জুত হাঙ্গাম সেইটে কি বিষ্টুচরণের হাতে চলে যেতে দেখবি?'

'আপনার কথা মাঝে মাঝেই কেমন যেন হেঁয়ালি লাগে বেজাবাবু। জিনিসটি যে কী সেটাই তো আজ অবধি খুলে বললেন না। একদিন কী একখান পুরোন ডায়েরি না কী একটা এসে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটাকে যত্ন করে রাখিস লখাই। যদি মাসখানেক গুছিয়ে রাখতে পারিস ম্যালা টাকা পয়সা পাবি।'

আমিও ভাবলুন বেজো মিত্তিরের মতো বড়লোক মানুষ যখন বলেছে লুকিয়ে রাখতে তখন খুব দামি কিছু হবে। সেই ভেবে ঠাকুরের আসনের নীচে পুঁতে রেখেছি। কিন্তু সেই নিয়ে যে এত হ্যাঙ্গাম হবে সে জানব কী করে?'

'হুম। আমার চালে কিছু ভুল ছিল না রে লখাই। তুই মানুষটা সরল আর একটু বোকা হলে কী হবে, সৎ আর একরোখা। তা ছাড়া এককালে তোর সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির একটা রিলেশনও ছিলো, জানিস বোধহয়। ভাবলাম তোর কাছেই বোধহয় ডায়েরি আর ম্যাপটা সুরক্ষিত থাকবে।'

'ওই ম্যাপ? ওতে আবার ম্যাপ পেলেন কই? একদিন তো খুলে দেখলাম, বইটার পাতায় পাতায় অং বং চং করে কীসব লেখা, দেখতে বাংলার মতো কিন্তু বাংলা নয়। একটা পাতায় আবার ঘর দরজা কীসব আঁকা, তার সারা গায়ে চিত্তির বিচিত্তির আলপনা। আরেক পাতায় একটা ঘড়া না কী, তার গলা জড়িয়ে একটা সাপ না কী নেতিয়ে আছে। ঘড়ার মাথায় আবার লাইট মারছে। আমি তো দেখে হেসে মরে যাই। ছোঃ, ওটাকে ম্যাপ বলে? ওফফ ম্যাপ দেখেছিলুম বটে আমাদের ক্লাস সেভেনের ভূগোল বইতে। সে হচ্ছে গিয়ে গাদাগুচ্ছের নদীনালা পাহাড় পর্বত শহর টহরের নাম নিয়ে এক নান্দিভাস্যি কাণ্ড। সেসব কী নাম, এখনও দু-একটা মনে আছে বইকি! নদীর নাম মাসিপিসি, মরুভূমির নাম টাকলা মাকুন্দ, পাহাড়ের নাম আন্দাজ না বরকন্দাজ কী একটা...

'ওই জন্যই তো রে লখাই, এই সরল গাম্বাটপনার জন্যই তো তোকে এত ভালোবাসি।'

'দেখুন বেজাবাবু আপনি কিন্তু ফের খুবই অপমান টপমান করছে। এবার কিন্তু ওসব বেজাস্তুতো না মাসতুতো কী একটা বললেন ওসব বলে পার পাবেন না বলে দিচ্ছি, হ্যুঁ।'

'এই দেখো, ছেলে ফের রাগ করে। ওরে গাম্বাট মানে জানিস? জি ইউ এম গাম মানে হচ্ছে আঠা, আর বি ইউ টি বাট মানে হচ্ছে কিন্তু। অর্থাৎ যার মনের মধ্যে ''কিন্তু' ব্যাপারটা আঠার মতো লেগে থাকে, তাকেই বলে গাম্বাট।''

'ইয়ে, সেটা কি খুব ভালো কিছু বেজাবাবু?'

'ওরে পাগল এই যে মনের মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু ব্যাপার, এর মানেই হচ্ছে প্রশ্ন। আর কে না জানে প্রশ্নই হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। অর্থাৎ কী তোর মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো বর্ষার জলে কইমাছের মতো খলবল করে উঠছে। এবার খাপলা জাল ফেলে ধরে ফেললেই হাতে গরমাগরম জ্ঞান পেয়ে গেলি। এবার সেটাকে গঙ্গাযমুনা করে খাবি নাকি ফুলকপির ঝোল করে সেটা তোর ব্যাপার।'

'কিন্তু কইমাছে তো বড্ড কাঁটা থাকে বেজাবাবু।'

'এই তো ব্যাপারটা জলবত্তরং ধরে ফেলেছিস। ওরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটা শুনিসনি, কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন ইলিশ তুলিতে?'

'এই বার ব্যাপারটা বেশ খোলসা হল। কিন্তু কিন্তু একটা কথা বলুন বেজাবাবু, আপনার অত পেল্লায় সাইজের প্রাসাদ থাকতে পুরোনো ডায়েরিখানা আমার বাড়িতেই বা রাখতে দিলেন কেন?'

'কারণ আছে রে লখাই। ঘোরতর কারণ আছে। বহুদিনের চেষ্টায় যে ধাঁধার সমাধান করতে পেরেছিলাম, ভেবেছিলাম তার ফসল একাই ভোগ করব। কিন্তু যাকে শত্রু ভেবেছিলাম আর যাকে বন্ধু ভেবেছিলাম তারা যে জায়গা পালটে ফেলবে সেটা আগে থেকে কী করে বুঝব বল?'

'সেই থেকেই কী গণ্ডগোলটা পেকে উঠল বেজাবাবু?'

'সে আর বলতে? ভাগ্যিস ডায়েরিটা তোর কাছে আগে রেখে গেছিলাম। তুই তো জানিসই লখাই, তালা আর চাবি একজায়গায় রাখতে নেই, তাতে চোরের সুবিধে হয়।'

'সে কী আর বুঝিনি বেজাবাবু? আন্দাজ করেছি অনেকটাই। কিন্তু তাতে করে কি আর এই হাঙ্গাম হুজ্জোত থেকে আমি বা আপনি রক্ষা পেলুম?'

'সেটা তোর দোষ নয় রে লখাই। পুরোটাই আমার নির্বুদ্ধিতা। ওই যে বললাম, শত্তুর চিনতে ভুল করেছি। তারই দণ্ডভোগ করছি এখন।'।

'তা এখন কী করণীয় বেজাবাবু?'

'ওই ডায়েরিটা যেন তেন প্রকারেণ রক্ষা করতে হবে রে লখাই।'

'কিন্তু কী করে? এই তো বললেন ভজন নাকি ভিটে ছেড়ে পালাবার মনস্থ করছে। তা ও যদি বাড়ি ছেড়ে লম্বা দিয়েই থাকে থাকলে কীসের কী রক্ষা করা।'

'সেটাই তো চিন্তার রে লখাই। আগে তোর ভাইপোর ওই বাড়ি ছেড়ে পালানোটা আটকাতে হবে। তারপর ম্যাপটা উদ্ধার করতে হবে। তারপর ওকে দিয়েই বাকি কাজ সমাধা করতে হবে।'

'বাকি কাজ বলতে?'

'যে কাজের জন্য আমি ঘর ছেড়ে পাগলের মতো কানপুর দিল্লি আর লখনউ শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি পাঁচটা বছর।'

'কী কাজ বেজাবাবু? একটু খোলসা করে না বললে শরীরে মনে তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না যে।'

'সে তো তোকে এখন বলতেই হবে রে লখাই। এ ছাড়া আর উপায় নেই। বলি আমাদের জমিদারবাড়ির গুমঘরের কথা শুনেছিস তো।'

'তা শুনিনি বললে নেহাত অধর্ম হবে বেজাবাবু, হাজার হোক এত পুরুষের সম্পর্ক। কিন্তু সেসব তো সবই গল্পকথা। শুনেছি আজ অবধি অনেক চেষ্টাচরিত্তির করেও কেউই ওই গুমঘরের খোঁজ পায়নি। কিন্তু তার সঙ্গে ওই ডায়েরির কী যোগাযোগ বেজাবাবু?'

'যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ রে লখাই, খুবই ঘনিষ্ঠ। যদি ওই ছবিটা ভালো করে দেখতিস, তাহলে বুঝতে পারতিস যে ওটা ঘড়া নয়, একটা কলসীর ছবি। আর তার গলা জড়িয়ে যে সাপের ছবিটা আছে ওটা যখ।'

'য য য যখ? আমি কি ঠিক শুনলাম বেজাবাবু?'

'একদম ঠিক শুনেছিস লখাই। আর ঘড়ার মুখে যে লাইট মারার কথা বলছিলিস ওটা টর্চের লাইট নয়, ধন-রত্নের আভা।'

'তা তা তার মানে কী বেজাবাবু?''

'তার মানে যেটা তোকে রাখতে দিয়েছিলাম ওটা যে সে ডায়েরি নয়রে লখাই। ওটা একটা গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার নকশা, আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সম্পদ। বহুকষ্টে ওই ডায়েরির সঙ্কেত উদ্ধার করে গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিলাম। আর সেই গুপ্তধন রাখা আছে আমাদের ওই গুমঘরেই।'

* * *

সন্ধেবেলার দিকটায় মনস্থির করেই ফেলল ভজন। নাহ, ঘুঘুডাঙায় আর থাকা চলবে না তার। কাকা মারা যাওয়ার পর থেকেই সে বুঝতে পারছিল যে ঝড় একটা আসবেই। তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা তার আন্দাজে ছিল না।

শুতে যাওয়ার আগে ঘরটা একবার ভালো করে দেখে নিল ভজন। কাকা লখাই সামন্ত মারকুটে আর ডাকাবুকো লোক ছিল বটে, কিন্তু সংসারে তেমন হুঁশ ছিল না। ঘুঘুডাঙার শেষমাথায় এই বাড়িটা বানিয়ে গেছিলেন ভজনের বাবা'ই। ঘর বললে অবিশ্যি দালানকোঠা কিছু নয়। ইটের গাথনিতে দুটো ঘর, মাথায় টালির ছাউনি। একটায় ভজন থাকে, আরেকটাতে তার কাকা লখাই থাকত। ঘরের সামনে সামনে একটা ছোট বারান্দা। সেখানে বসে লখাই সামন্ত হাওয়া খেত আর সাধের লাঠিটাকে তেল খাওয়াত। ভজন অত বুঝত না, লাঠিকে অত তেল মালিশ করার কী আছে। লখাই হাসত আর বলত, 'নিজের ভালোমন্দ নিজেকেই দেখতে হয় রে বাপধন। এই লাঠির জোরেই না যত চোর বদমাশ দূরে থাকে। নইলে বাড়িঘর সম্পত্তি টম্পত্তি লোকে লুটেপুটে নিয়ে যাবে না?'

তাদের কী এমন টাকাপয়সা আছে যা লোকে লুটেপুটে নিয়ে যাবে সে কথাটা ভজন কোনওকালেই বোঝেনি। তাদের যা সম্পত্তির বহর, চোর বা ডাকাত দেখলে হয়তো হেসেই ফেলবে। খাট বলতে দু'ঘরে দু'খানা পায়া ভাঙা চৌকি। ভাঙা পায়ার জায়গাটা ইট দিয়ে উঁচু করা। শোওয়ার ব্যবস্থা বলতে তেলচিটে বালিশ আর কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথা। তৈজসপত্তরের অবস্থাও সেইরকমই, বারান্দার এককোণে একটা তোলা উনুন, আর কিছু তোবড়ানো হাঁড়িকুঁড়ি।

একটু আগেই একসেট থালা গেলাস নিজের চটের ঝোলাতে পুরে নিয়েছে ভজন। বাকি যা আছে সেসব নিয়ে যাওয়া আর রেখে যাওয়া একই ব্যাপার। এক সানকি পান্তাভাত নুন আর লঙ্কাপোড়া দিয়ে মেরে দিয়েছে ভজন। কাল রাত ভোর হতে হতে উঠে পড়তে হবে তাকে। তারপর সম্পত্তি বলতে তার যা যা আছে, দুটো লুঙ্গি, একটা ছেঁড়া প্যান্ট আর তিনটে রংচটা জামা, এসব নিজের ঝোলাতে নিয়ে কেটে পড়বে সে।

শুধুই কি তাই?

দোনোমোনো করে বহুকষ্টে জমানো বইগুলোর সঙ্গে সেই ডায়েরিটাও ঝোলায় পুরলো ভজন। কাকা যখন অত যত্ন করে লুকিয়ে রেখে গেছে, তার মানে এর মধ্যে নিশ্চয়ই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে।

কাকা মারা যাওয়ার পর ভয়ে আর চিন্তায় হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছিল ভজনের। কী করবে, কোথায় যাবে, কীভাবে পেটের ভাত জুটবে, কিছুই মাথায় খেলছিল না। এদিকে হাতে টাকাপয়সাও নেই একদম। তাই সে কাকার ঘর আঁতিপাঁতি করে খুঁজছিল, যদি অন্তত পক্ষে দু-একটা ছেঁড়া ফাটা নোটও পাওয়া যায়। বালিশ, তোষক, খাটের তোরঙ্গ, খাটের তলা, কিছুই দেখতে বাকি রাখেনি সে। এমনকি দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুরদেবতার ছবিগুলো অবধি নামিয়ে দেখেছে, যদি তার পেছনে দু-একটা নোট লুকিয়ে রাখা থাকে। কিন্তু কিচ্ছুটি পায়নি ভজন, একটা আধুলি অবধি না।

বেজাকাকা কি কিছুই দেয়নি কাকাকে? কাকা এমনি এমনি খেটে মরছিল?

শেষমেশ ঠাকুরের আসন ঘাঁটতে শুরু করে ভজন। আর সেই করতে গিয়ে সে ঠাকুরের আসনের নীচের মেঝেতে হালকা দাগটা খেয়াল করে। ভালো করে নজর না করলে বোঝা মুশকিল।

দুরু দুরু বুকে আসনটা সরায় ভজন, কাকা ওখানে কিছু লিখে রেখে যায়নি তো?

মাটি খুঁড়ে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট পায় ভজন। ভেবেছিল তাতে হয়তো কিছু টাকাপয়সা আছে। কিন্তু না, তার বদলে তার হাতে আসে এই ডায়েরিটা।

ডায়েরিটা সাইজে ছোটই, বড়জোর পাঁচ ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সাইজ হবে। লাল রঙের চামড়ায় বাঁধানো, পাতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রথম পাতায় একটা বিদঘুটে ছড়া, সেটা এরকম,

গোপন ধনেরে খোঁজে যে জন ইঙ্গিতে বোঝে
লীন হয়্যা যায় অজপদে।
কুঞ্জিকায় খোলে দ্বার দ্বারে খোলে কুঞ্জিকার
সন্ধানী বুঝেন চিত্রপটে।

তারপরের চারটে পাতায় পরপর চারটে ছবি আঁকা। প্রথম পাতায় একটা মস্ত দরজার ছবি, তার দু-ধারে কী সব অদ্ভুত নকশা, দ্বিতীয় পাতার ছবিতে আবার দরজার সামনে একটা মস্ত বড় চাবি, তার উচ্চতা প্রায় দরজার সমান। তৃতীয় ছবিতে আবার দরজার জায়গায় চাবির ছবি আঁকা, তার গায়ে দরজার কারুকার্যগুলোই। চতুর্থ ছবিতে একটা ঘড়া, তার গা জড়িয়ে একটা ভয়ংকর সাপ। পরের বেশ কয়েকটা পাতায় কয়েকটা আবোলতাবোল ছবি, তার কোনও মাথা মুণ্ডু নেই।

ডায়েরিটা পুরে একটু থুম হয়ে বসে রইলো সে। এদ্দিনের বাস ছেড়ে পালিয়ে যেতে কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে বটে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী?

গঙ্গা পেরিয়ে সামতাবেড়ের দিকে একটা চালকল খুলেছে বলে খবর পেয়েছে ভজন। পঞ্চায়েত বোর্ডের মেম্বার বিশু গুছাইতের ভায়রাভাই হরেন মুৎসুদ্দি সেখানের ম্যানেজার। গতবার পুজোয় হরেন মুৎসুদ্দি যখন ঘুঘুডাঙায় এসেছিল হরিণমারির বিলে মাছ ধরতে এসেছিল, তিনটি দিন তার খেদমত খেটেছে ভজন। তার কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে পড়লে একটা ব্যবস্থা কি একেবারেই হবে না?

তেলচিটে কাঁথাটার মাথার দিকটা পাকিয়ে বালিশ মতো বানিয়ে নিল ভজন। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু শুলে কী হবে? খানিক উশখুশ করার পর ভজন বুঝল যে আজ রাতে তার ঘুম আসা মুশকিল। এতদিনের পুরোনো বাসা ছেড়ে যাওয়ার জন্য মনটা তো উদাস হয়ে আছেই। তা ছাড়াও রাতটা বেশ গোলমেলে। একফোঁটা হাওয়া নেই কোথাও। তার ওপর একটা ভ্যাপসা গরম যেন জাঁকিয়ে বসেছে চারিধারে। বাইরে বেশ একটা থমথমে ভাব। পকাইদের বাড়ির দিকটা থেকে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল কেঁউ করে।

বার চারেক এপাশ ওপাশ করার পর উঠে পড়ল ভজন। খানিকক্ষণ না হয় বারান্দায় বসা যাক। মাথাটা ঠান্ডা হলে যদি ঘুম আসে।

দাওয়া বসতেই সামনের অন্ধকারটা বেশ খলবলিয়ে উঠল ভজনের সামনে। রারান্দার সামনে রুমালের মতো খানিকটা ফাঁকা জমি। তার বাইরে ভাঙাচোরা চিটেবেড়া। চিটেবেড়ার ওপারে কাঁচা রাস্তা। দিন দুয়েক আগে ওখানে দাঁড়িয়েই বেশ নরমে গরমে তাকে দু-কথা শুনিয়ে গেছিল বিষ্ণুচরণ তেওয়ারি। তাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। বছর দুয়েক আগে বিষ্ণুচরণের কাছে হ্যান্ডনোটে হাজার দুয়েক টাকা ধার নিয়েছিল লখাই। সেটাই নাকি এখন চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে হাজার দশেকে। অ্যাদ্দিন কাকা ছিল বলে বিষ্ণুচরণ তেমন ট্যাঁফোঁ করতে পারেনি। কিন্তু মাস খানেক আগে লখাই খুন হয়ে যাওয়ার পরেই বিষ্ণুচরণ যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। দিন দুয়েকের ভালোয় ভালোয় টাকা ফেরত না পেলে যে ভজনকে তার পৈতৃক ভিটেখানির মায়া ছাড়তে হবে, সেটাও স্পষ্ট করে সেটাও জানিয়ে দিয়ে গেছে সে।

বলা বাহুল্য, ভজনের পক্ষে এখন দশ হাজার কেন, দশ টাকা দেওয়াও সম্ভব না। অ্যাদ্দিন ধরে কাকার দৌলতে পেটের ভাতটা জুটে যাচ্ছিল কোনওমতে। কিন্তু দিন দুয়েক হল সে একরকম উপোস করে আছে বললেই চলে। এদিক ওদিক উঞ্ছবৃত্তি করে কোনওক্রমে চলে যাচ্ছিল তার। এমনকি সদ্বংশের ছেলে হয়েও ভজন শেষমেশ রামপিয়ারি দুসাদের দুটো রিকশার একটা চালানো শুরু করেছিল। কিন্তু হপ্তাখানেক হল রামপিয়ারি রিকশাদুটো বেচে আর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে চারটে টোটো কিনেছে। শুধু তাই নয়, দেহাত থেকে দুটো মুশকো মুশকো ভাতিজাকেও এনেছে সে। এখন রামপিয়ারি নিজে, তার ছেলে, আর দুটো ভাতিজা, এই চারটে ঘুঁফো মস্তান মিলে ঘুঘুডাঙা বাজার থেকে স্টেশন অবধি রাস্তাটাকে পাটনার রাজপথ করে ফেলেছে প্রায়। চারজনে মিলে দিনে হুমহাম খাটে, সন্ধেবেলায় রাক্ষসের মতো ছাতু খায়, রাতে ঢোল বাজিয়ে ছ্যা যাঁ যাঁ যাঁ করে গান গায় আর কেউ কিছু বলতে গেলেই চোখ পাকিয়ে মারতে আসে। ওদের সঙ্গে লড়তে যাবে ভজন? ছোঃ! তার প্রাণের ভয় নেই?

তা ছাড়া ভজনের হয়ে লড়ার মতো সেরকম কেউ নেইও এই জগতে। ভজনের জন্ম দিতে গিয়েই ভজনের মা মারা যান। ভজনের বাবা কানাই সামন্ত পত্নীবিয়োগের শোকে কয়েক বছর মুহ্যমান হয়ে থেকে একদিন সকালে বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

কানাই সামন্ত স্বভাব চরিত্রে লখাইয়ের একদম উলটো ছিলেন। লখাই যেমন ডাকাবুকো, কানাই তেমনই শান্ত ধীরস্থির মিঠে স্বভাবের। চমৎকার পালাগানা বাঁধতেন, ভালো বাঁশি বাজাতেন, মাটি ছেনে খুব ভালো মূর্তি গড়তে পারতেন। ছোটবেলার স্মৃতি খুব বেশি মনে পড়ে না ভজনের।

আজ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতে হু হু করে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছিল ভজনের। কাকার কথাও মনে পড়ছিল খুব। লখাই সামন্ত উচ্চতায় ছিল পাঁচ ফুট, গায়ের রং ঘোর কালো, আর

মেজাজে সাক্ষাৎ ডাকাত। দুর্মুখ এবং বদমেজাজি বলে কুখ্যাত লখাই তাঁর মা-মরা ভাইপোটিকে নিজের ছেলের মতই রক্ষা করে এসেছে এতদিন। লোকে বলত ভজনের জন্যই আর লখাইয়ের সংসার করা হয়ে উঠল না।

রাতের অন্ধকারটা বেশ জমাটি হয়ে এসেছে। কাকার কথা ভাবতে ভাবতে একটু ঢুলুনি এসেছিল ভজনের। সেই হালকা ঘুমের ঘোরেই তার মনে হল কানের কাছে একটা মশা যেন বিনবিন করছে। সেদিকে একটা আলতো চাপড় চালাল ভজন। বলা বাহুল্য, তাতে কিছুই হল না। ঢুলতে ঢুলতেই কানের কাছে হাত নেড়ে মশাটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল সে। আর তখনই মনে হল তার কানের কাছে অত্যন্ত সরু গলায় কে তারস্বরে চেল্লাচ্ছে, 'মর্কট, অলম্বুষ, জাম্বুবান, অলপ্পেয়ে, রাতদিন শুধু ঘুম আর খাওয়া, খাওয়া আর ঘুম।'

চটকা ভেঙে উঠে বসল ভজন। এই গলা তার চেনা বললে কম বলা হয়, আজীবন এই চোপা শুনেই মানুষ হয়েছে সে। কিন্তু এখন তো সেসব শোনার কথা নয়।

সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল সে।

চারদিকে বেশ একটা থমথমে আবহাওয়া তো ছিলই। এবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে একটা অন্য ব্যাপার। সামনের অন্ধকারটা বেড়ে উঠে একেবারে আলকাতরার মতো কালো হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে, আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকি ঝিঁঝিঁও ডাকছে না।

ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল ভজন। ফের তখনই তার কানে ফের সেই শব্দ, 'ঢেঁড়স, কুঁড়ে, গোবরগণেশ। নিজের সাত পুরুষের বাস কেউ ছাড়ে? এইজন্য খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলাম তোকে?'

একেবারে সেই বাজখাঁই গলা আর গায়ে হুল ফোটানো গালমন্দ। ভুল করার কোনও চান্সই নেই। লখাই সামন্ত'র মেজাজকে ভয় করত না এমন মানুষ ঘুঘুডাঙায় একটিও নেই।

ভজনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একে চারিদিকে একটা হুতুমথুমো অন্ধকার, নিঝুম রাত, একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তার মধ্যে এসব কী অলুক্ষুণে ব্যাপারস্যাপার?

আরও খানিকক্ষণ কান পেতে রেখেও যখন আর কিছু শুনতে পেল না ভজন, তখন সে ঠিক করল এবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যাক। তার ঘুমটাও পেয়েছিল জব্বর, তাই বিছানায় শুতে শুতেই গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

* * *

পরের দিন ঘুমটা ভাঙতে ভজন বুঝতে পারল যে তার বাড়ি থাকার মেয়াদ আরও একদিন বেড়ে গেছে। কারণ এখন বেলা বেড়ে সূয্যি ঠাকুর এখন প্রায় মাথার ওপর, আর তার একটু জ্বর মতো লাগছে।

গরিবের জ্বরজারি হল গিয়ে উটকো অতিথি, জ্বালায় বটে কিন্তু বেশিদিন থাকে না। তা ছাড়া রোগভোগবাতব্যাধিরও নানান কাজকম্ম আছে। একজায়গায় বসে থাকলে তাদের চলার কথা নয়। ফলে ব্যাপারটাকে আমল দিল না ভজন। কিন্তু তার চিন্তা অন্য জায়গায়। এক, আজকের দিনটা সে খাবে কী? দুই, বিষ্ণুচরণের লেঠেল এসে হাঁকার দিলে সে ঠিক কী বলে তাদের ঠেকাবে।

বিছানা থেকে উঠে কুয়োতলায় গিয়ে চোখেমুখে জল দিল ভজন। ফিরে আসবে, এমন সময় একটা জিনিস একটু অদ্ভুত লাগল তার।

কোণার শিউলি গাছটার পাশে পেয়ারা গাছটা ছিল না? এখন সে জায়গায় বেঁটে কুলগাছটা এল কী করে? আর পেয়ারা গাছটা অমন বেড়ার কাছ ঘেঁষে চলে গেল কী করে?

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ছোটবেলা থেকে সে দেখে এসেছে শিউলি গাছের পাশে পেয়ারা গাছটা, আর তাদের পেছনে কুলগাছ। এখন কী করে সেটা বদলাবদলি হয়ে যায়? চোখে ভুল দেখছে না তো?

কাছে গিয়ে আরও ভোম্বল হয়ে গেল সে। গাছ যেরকম ছিল সেরকমই আছে। গাছের গোড়ার মাটি যেমন ছিল তেমনই আছে। অথচ ছোটবেলা থেকে গাছগুলোকে যেখানে যেখানে দেখে এসেছে সে গাছগুলো

মোটেও সেখানে সেখানে নেই।

ভজন পুরো হতভম্ব হয়ে গেল। গাছেরা হেঁটে চলে বেড়ায় এমন গল্প কস্মিনকালেও শোনেনি সে। তার ওপর তারই বাড়ির পেছনের বাগানে এসব অনৈসর্গিক কাণ্ডকারখানা?

ভজনের গা'টা এই চড়া রোদেও একটু শিরশির করে উঠল। তার মাথার ব্যামো ধরল নাকি? কানে ভুল শুনছে, চোখে ভুল দেখছে, এসব তো ভালো লক্ষণ নয়!

সন্তর্পণে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বাগানের বাকি গাছগুলো দেখার চেষ্টা করতে লাগল ভজন। আর তখনই সে দেখল কুলগাছটার কাছে মাটিতে একটা বটুয়া পড়ে আছে।

একটু দোনোমোনো করে বটুয়াটা হাতে তুলে নিল ভজন। তারপর সেটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তার ঠাকুমার বটুয়াটা না? যেটা পুরী ঘুরতে গিয়ে ন'পাড়ার দোক্তাদিদা এনে দিয়েছিল? একদম তাই। সেই রং জ্বলে যাওয়া বাসন্তী হলুদ রঙের বটুয়াটা। এখন মাটিফাটি লেগে তার অবস্থা কাহিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বটুয়া তো ঠাকুমা ফেলে দিয়েছিল কবেই। সেটা এখানে এল কী করে?

বটুয়া'র দড়ি খুলল ভজন। ভেতরে একতাড়া নোট। সবই পঞ্চাশ আর একশো টাকার, একটা নোংরা সুতলি দিয়ে বাঁধা। কাঁপা কাঁপা হাতে নোটগুলো তুলে নিল সে। গুণে দেখল পাক্কা হাজার টাকা আছে।

এই আশ্বিনের সকালে গামছা পরে কলতলায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল ভজন। এ বটুয়া এখানে কী করে এল? তার মধ্যে এত টাকা কী করে এল?

তবে কি না পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাছাড়া সাতসকালে এতবার হতভম্ব হওয়াটা ভালো দেখায় না। ভজন বটুয়াটা ঘরে রেখে কুয়োর জলে ঝটপট স্নান করে নিল। তারপর কাল রাতে যে ঝোলাটায় জিনিসপত্র ভরেছিল সে সেখান থেকে একটা ছেঁড়া প্যান্ট আর একটা তাপ্পি মারা জামা পরে বেরিয়ে পড়ল সে। পকেটে পাঁচটা একশো টাকার নোট।

ঘুঘুডাঙার গঞ্জের বাজারের মুখটায় কচুরি বানায় হনুমান মিশির। সঙ্গে হিং দেওয়া আলু মটরের তরকারি। হনুমানের কচুরি দেবভোগ্য জিনিস। লোকে বলে একবার মুখে দিলেই পুনর্জন্মের গেরোটা অনেকটা আলগা হয়ে যায়। সকালে এইদিকটা কচুরির গন্ধে চারিদিক ম' ম' করতে থাকে, আর তার সামনে সিকি মাইল লম্বা লাইন। গোঁসাইপাড়ার কবিরাজ মাধব আচায্যি মশাই তো সেবার সার্টিফিকেটই লিখে দিলেন, 'হনুমান হালুইকরের কচুরি অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু। ইহা একাধারে বলকারক, ক্ষুধাবর্ধক, মুখরোচক এবং অগ্নিমান্দ্যনাশক। আমি বহুকাল যাবৎ ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত আছি।' সেই সার্টিফিকেট এখনও সযত্নে হনুমানের দোকানের দেওয়ালে টাঙানো।

এখন বাজার উঠে যাওয়ার মুখে, লোকজন বেশি নেই। হনুমানের দোকানের উনুনের আঁচও নিভুনিভু। সামনের বেঞ্চে বসে ভজন একটু দোনোমোনো করে বলল, 'কচুরি হবে।'

হনুমান মিশির একটু টেরচা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোবে তো বোটেই। কিন্তু মাংনা হোবে না ভজনা, পোয়সা লাগবে। তোমার আগের পোনচাস টাকা এখোনো বাকি আছে।'

পকেটে পয়সা থাকলে বুকে জোর আসে। ভজন পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে হনুমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'ভজনসামন্ত গরিব হতে পারে, কিন্তু ভিখিরি নয় হনুমানজী, এই নিন টাকা। আর হ্যাঁ, আগের টাকাগুলো কেটে রাখবেন কিন্তু।'

হনুমান মিশির টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে বলল, 'আরে আরে রামজি। এ তো তাজ্জবের বাত হোয়ে গেল রে ভজনুয়া। টেকা পেলি কোথা থেকে তুই?'

ভজন শার্টের ভাঙা বাটনটা লাগাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'সেসব কথা থাক ভজনজী। ঝট করে চারটে কচুরি দিন। দেখবেন, কচুরি যেন গরম থাকে, আর তরকারিতে যেন শুধু তলানির ঝোল না, কিছু আলু আর মটরও থাকে।'

হনুমান মিশির বুদ্ধিমান লোক। সে বুঝে গেল যে ক্যাবলার হাতে কিছু পয়সা এসেছে। সে হেঁ হেঁ করে বলল, 'সে তো বোটেই, সে তো বোটেই। গরমাগরম কচৌরিই পাবি রে ভজোন।' বলে দোকানের ছোকরা কর্মচারীটির দিকে একটা হাঁক দিল, 'আরে ও রামপরসাদ, ভজুয়া বাবুকে লিয়ে চার ঠো কচৌরি ফটাফট ভেজে লিয়ে মেরে বাপ। আর সব্জি উব্জি ভি ঠিক ঠাক লে আনা, সমঝা কেয়া?'

হনুমানের দোকান থেকে এক ডজন কচুরি আর গন্ডা খানেক মিঠাই খেয়ে পেটটা ঠান্ডা হল ভজনের। বোধকরি পাঁচ ছ'মাস বাদে এমন অমৃত ভোজন জুটল। আর শুধু পেট ঠান্ডা কেন, বুকে বেশ একটু বলও অনুভব করছে সে। সেটা পেট ঠান্ডা হওয়ার জন্য না বুক পকেটে টাকা থাকার জন্য, বলা মুশকিল।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল এর পরেই। হনুমানের দোকান থেকে বেরোবার মুখেই ভজনকে চেপে ধরল করিম খাঁ আর হরেকৃষ্ণ সাঁপুই, বিষ্ণুচরণের দুই পোষা লেঠেল। করিম খাঁ খপ করে ভজনের কলার চেপে বলল, 'কী রে শালা, মালিকের পয়সা মেটাবার নাম নেই, এখানে বসে মস্তি করে কচুরি খাওয়া হচ্ছে?'

হরেকৃষ্ণও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ভজন নিজের কলারটা ছাড়িয়ে নিয়ে করিমের গালে একটা পেল্লায় থাপ্পড় কষিয়ে বলে উঠল, 'চোপরাও বেয়াদপ। ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা কইতে হয় কেউ শেখায়নি তোকে?'

ভজন রোগাপাতলা ছেলে, তারওপর আজ অবধি কেউ তাকে উঁচু গলায় কথা অবধি বলতে শোনেনি। করিম খাঁ তাই থাপ্পড়টা খেয়ে এত হতভম্ব হয়ে গেল যে নিজের গালে হাত বুলোবার কথাটা অবধি মনে রইল না তার। হরেকৃষ্ণ'র অবস্থাও তথৈবচ, তার হাত থেকে লাঠিটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলে হরেকৃষ্ণ'র হাতে ধরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় ভজন বলল, 'একটু পরেই তোদের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। জানিয়ে রাখিস।'

* * *

বিষ্ণুচরণ কিন্তু পাঁচশ টাকা পেয়ে খুশি হল না মোটেই। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে অপ্রসন্নস্বরে বললেন— 'এ তো পাঁচশো রুপিজ হল রে ভজনা, রেস্ট অফ দ্য টাকা কোথায়?'

ভজন পায়ের ওপর পা তুলে বেশ একটা রাজকীয় হাসি হেসে বলল, 'পেয়ে যাবেন বিষ্টুবাবু, এই সপ্তাহেই পেয়ে যাবেন। ভজন সামন্ত মিথ্যে কথা বলে না।' কথাটা বেশ জাঁক করে বলল বটে, কিন্তু ভজনের বুকটা দুরুদুরু করছিল। এত টাকা সে পাবে কোথায়?

বিষ্ণুচরণ ভুরু কুঁচকে ভজনের বসার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করল। সে ঘাঘু লোক, যা বোঝার বুঝে নিল। মিষ্টি করে হেসে বলল, 'সে তো বটেই, সে তো বটেই। আমি কি তোকে চিনি না ভজন, সেই চাইল্ডহুড থেকে তোকে দেখছি। সেদিন না হয় দুটো হার্ড কথা বলেই ফেলেছি। সেজন্য কিছু মনে করিসনি তো বাপধন?'

ভজন ভারিক্কিচালে বলল, 'তাই বলে কারও বাড়িতে চড়াও হয়ে অপমান করাটা কোনও কাজের কথা নয় বিষ্টুকাকা। আপনার টাকাটা আশা করছি এই মাসেই দিয়ে দিতে পারব। আপাতত আমি উঠলাম।' এই বলে বেশ রাজসিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল ভজন।

ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ সেদিকে রইল বিষ্ণুচরণ। তারপর বলল, 'ম্যাটারটা কী ঘটল কিছু বুঝলি হরে?'

হরেকৃষ্ণ বলল, 'ছোকরা কোনও গতিকে কিছু টাকাপয়সা পেয়েছে মনে হয়। নইলে আপনার গদিতে এসে আপনার ওপরেই চোটপাট করে যায় এমন লোক তো বেশি দেখিনি কর্তা।'

বিষ্ণুচরণ চিন্তিত মুখে বলল, 'ছোকরা মানি পেল কোথায়? আর যদি ধারের টাকাটা মিটিয়েই দেয় তাহলে লখাইয়ের হাউসটাই বা হাতে পাই কী করে?'

করিম খাঁ মাথা চুলকে বললো, 'গোস্তাখি মাফ করবেন হুজুর। কিন্তু ওই ভাঙাচোরা মকান কিনে কি খুব লাভ হবে? গাঁওয়ের একেবারে শেষের দিকের জমিন, তাও এত্তটুকু।'

'জমিটা তো আমি চাইছি না রে করিম। আমার ওই বাড়িটা দরকার।'

'কিন্তু সে তো একেবারে পোড়ো ঝুরঝুরে মকান হুজুর।'

'ওই ব্রোকেন ঝুরঝুরে বাড়ির মধ্যেই কোথাও একটা স্মল ডায়েরি লুকোন আছে, বুঝলি করিম। ওইটে আমার চাই, যে করে হোক।'

হরেকৃষ্ণ মাথা চুলকে বলল, 'একটা ডায়েরির জন্য এত খাটাখাটুনি কেন কর্তা?'

বিষ্ণুচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আছে রে হরে, আছে। বিস্তর কারণ আছে। ওটার জন্যই নাইটে ভালো ঘুম হচ্ছে না আমার।'

করিম খাঁ ভারি অবাক হয়ে বলল, ''তার জন্য এত হাঙ্গামার দরকার কী হুজুর? বলেন তো শেখ পাড়ার মইনুল হাকিমকে ডেকে আনি, এমন দাওয়াই দেবে যে বিস্তরে শুলেই ঘুমিয়ে যাবেন।''

বিষ্ণুচরণ কুপিত হয়ে করিমের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মধুর স্বরে বলল, 'হ্যাঁ রে করিম, তোদের মইনুল হাকিমের কাছে ব্রেনে গ্রে ম্যাটার বাড়াবার কোনও ওষুধ নেই?'

করিম চিন্তিত মুখে বলল, 'ছানবিন করলে হয়তো তাও পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনার কি নিন্দের সাথ সাথ মগজের ঘিলুও চাই হুজুর? সে তো ঝামেলার কাম মালুম হচ্ছে। কাল তাহলে মইনুল চাচাকে এত্তেলা দিই?'

বিষ্ণুচরণ কথাটা শুনে এত অবাক হয়ে গেল যে মুখে কথা যোগাল না তার। সেই সুযোগে হরেকৃষ্ণ বলল, 'কর্তা, বলছি কী, এসব ছোটখাটো জিনিস তুলে আনার জন্য গনু চোরই তো আছে। নইলে হুকুম দিন, চারটে লেঠেল নিয়ে সারা বাড়ি তছনছ করে ফেলি। ওই তো দুটো ভাঙাচোরা ঘর, খুঁজে পেতে কত সময়ই বা লাগবে?'

বিষ্ণুচরণ বলল, 'উঁহু, ওসব প্যান্ডেমোনিয়াম একদম না। কয়েকদিন আগেই একটা ট্রাবল গেছে। সেসব থিতিয়ে যাওয়ার আগে আমি কোনওরকম কোনও ডিস্টার্বিং-এ জড়াতে রাজি নই।'

হরেকৃষ্ণ বলল, 'ডায়েরিটা তো ভজনের কাছেও থাকতে পারে কত্তা। গোটা বাড়িটা দখল করার দরকার কি? ওকে একদিন তুলে এনে পেট থেকে কথা আদায় করে নিলেই তো হয়।'

বিষ্টুচরণ চিন্তিতমুখে বলল, 'না রে হরে, আমার মনে হয় ডায়েরিটা ওই লখাইয়ের হাউসেই কোথাও লুকোনো আছে। বেজা মিত্তির কি যেমন তেমন হিউম্যান ছিল রে, বুদ্ধিতে আমাকেও টক্কর দিত। আমি তো প্রথমে বিলিভই করিনি যে লোকটা ডায়েরিটা নিজের অত বড় ম্যানসনের বদলে লখাইয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। ইন্টেলিজেন্সিয়াটা ভাব একবার। তোর কি মনে হয়, লখাই বা বেজা ওই ডায়েরিটা এমন জায়গায় হাইড রাখবে যেখানে ওই ভজনের হাত পৌঁছবে?'

হরেকৃষ্ণ চিন্তিতস্বরে বলল, 'তাহলে তো ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্তা। যে ডায়েরি যে আমরাও উদ্ধার করতে পারব তারই বা গ্যারান্টি কি?'

বিষ্টুচরণ গম্ভীর হয়ে বলল, 'গ্যারান্টি থাক না থাক, ট্রাই আমাদের করতেই হবে রে হরে। ওর ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আছে। অনেক দূর অ্যাডভানস করে এসেছি রে হরে, এখন আর ব্যাক করার উপায় নেই।'

করিম বুক চিতিয়ে বলল, 'তাহলে হুকুম দিন হুজুর, ভাতিজাকেও একদিন সময় সুযোগ বুঝে চাচা'র কাছে রওয়ানা করিয়ে দিই, ঝামেলা খতম।'

বিষ্ণুচরণ খেঁকিয়ে উঠল, 'হরে, এই গাছপাঁঠাটাকে কাছারি থেকে এক্ষুনি থ্রো আউট করে দে তো। ব্যাটার বুদ্ধি তো নয়, খাজা জ্যাকফ্রুট। বলছি আমি কোনও হাঙ্গামা হুজ্জোতি চাইছি না, ইনি একেবারে রায়ট করতে ছুটেছেন। এইজন্যই বলি শুধু হাতে পায়েই বড় হয়েছিস তোরা, ব্রেনে বুদ্ধি বলতে কিস্যু নেই। এই কদিন আগেই একটা ব্লাডারক্তি হয়ে গেছে গ্রামে। তোদের কি ধারণা, পুলিশ নজর রাখছে না? তারপরও আরেকটা মার্ডার করতে চাস?'

দুই স্যাঙাত অনুতপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

''শোন করিম, যা করার মাথা কুল করে করতে হবে। তোরা শুধু গনুকে বলে দে ভজনের বাড়ির ওপর নোটিশ রাখতে। সাসপেক্টিং কিছু দেখলে যেন আমাকে এসে জানায়। আর টাকাটা ও পেল কোত্থেকে তার একটা পাত্তা লাগানোর ব্যবস্থা কর। যা করবি, চুপিচুপি। দেখিস, ক্রো বার্ডেও যেন টের না পায়।'

* * *

হেমনলিনী দেবী কুঁদুলে হিসেবে শুধু ঘুঘুডাঙা কেন, পুরো পরগণায় বিখ্যাত। অমন কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠ, অমন বাছাবাছা বাক্যবাণের ছটা, অমন কথার পিঠে লাগসই কথা গুঁজে দেওয়া, অমন মন মাথা আর থুতনি নেড়ে তেড়ে আসা, সে জিনিস দেখেও সুখ, শুনেও পুণ্য। লোকে বলে কলহ পটিয়সী শূর্পণখা পরজন্মে হেমনলিনী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। হেমনলিনী আসরে নেমেছেন শুনলেই মুখে মুখে কথা রটে যায়, আশেপাশের পাড়ার লোকজন ঠেলাঠেলি করে পিসিমার শো দেখতে আসে। এমনও দেখা গেছে হেমনলিনী মুখে ফেনা তুলে লড়ে যাচ্ছেন, ওদিকে চারিদিক দর্শকদের 'কেয়াবাত', 'মাশাল্লাহ', 'বহোত খুব' ধ্বনিতে মুখরিত।

আজকাল তো অনেকে হায়ার করেও নিয়ে যাচ্ছে হেমনলিনীকে। বিভিন্ন কাজের জন্য হেমনলিনী বিভিন্ন রেট হেঁকে থাকেন। স্কুলের হেড মাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করার রেট এক, ননদ বৌদির ঝগড়ার রেট আরেক, আর পাশের বাড়ির ভাড়াটে হলে আলাদা দাম। তবে সরকারি দফতরে গিয়ে ঝগড়া করার জন্য পিসি চড়া দরই হাঁকেন, সার্ভিস চার্জের সঙ্গে সার্ভিস ট্যাক্স আলাদা!

এদিকে হেমনলিনীর দৌলতে ঘুঘুডাঙার সম্মান গেছে বেড়ে। লোকে আজকাল হেমনলিনীকে ঝগড়ুটে বলে না, বলে কলহ শিল্পী, দেখলে সশ্রদ্ধভাবে রাস্তার ধারে সরে দাঁড়ায়, বলে মাননীয়া রোঁদে বেরিয়েছেন! পাড়ার লোকজন বিশু গুছাইতকে ধরে বসেছে, হেমনলিনীর জন্য একটা কোয়ারেলশ্রী উপাধির ব্যবস্থা করার জন্য।

আজ বিকেলের দিকটায় হেমনলিনী জলমুড়ি খেয়ে এসেছিলেন সতীশ চাকলাদারের দাঁতের ডাক্তারখানায়। সতীশ চাকলাদার এঁর ব্যাপারে শুনেছেন, তবে সাক্ষাৎ মোলাকাত আগে হয়নি একেবারেই। তিনি একটা মোটা মেডিক্যাল জার্নাল খুলে পড়ার চেষ্টায় ছিলেন। আগের দিনের মতোই একজন দুজন করে লোক জমা হচ্ছে আড্ডার নেশায়। গগন মল্লিক এখনও এসে পৌঁছননি।

হেমনলিনী ডাক্তারখানার সামনে দাঁড়িয়ে সতীশ চাকলাদারের উদ্দেশ্যে মধুর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভালো মানুষের পো, তুইই আমাদের গেরামের নতুন দাঁতের ডাক্তার নাকি।'

সতীশ চাকলাদার আন্দাজে বুঝলেন ইনিই তিনি। মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ দিদি। আসুন, বসুন। দাঁতের কোনও অসুবিধা হয়েছে?'

'খুবই অসুবিধা হচ্ছে রে বাছা, সে আর কী বলি। খেতে পারছি না, কথা বলতে পারছি না, ঝগড়া করতে পারছি না। বলছি কি, দাঁত তুলে দিতে পারবি ভাই?'

'ওটাই তো আমার কাজ দিদি। বলুন না, কার দাঁত?'

'আমারই দাঁত বাবা। তুলে দিতে পারবি তো? ঠিক করে বল, নইলে ও পাড়ার বছিরুদ্দিকে ডাকি তাহলে।'

'বছিরুদ্দি মিঞা কুয়ো সারায় বলে শুনেছিলাম। সে দাঁতের ডাক্তারিও শুরু করলো নাকি?' চিন্তিত হয়ে পড়েন সতীশ ডাক্তার, 'এ তো বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল দেখছি দিদি!'

'পারবি বাবা? ভরসা দিচ্ছিস তো? তাহলে চল বাবা। আর দেরি করিসনি। আমার বাঁধানো দাঁতখানা মুখ ধুতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে গেছে। একটু তুলে দে দেখি।'

সতীশ চাকলাদার খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। উপস্থিত বাকিরাও তথৈবচ। হাতে পায়ে সাড় ফিরে পেতে সতীশ ডাক্তার হাতজোড় করে বললেন, 'চোয়ালের দাঁত তুলে দিতে পারি দিদি। আপনি

এলেন, চেয়ারে বসলেন একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে টক করে দাঁতটা তুলে দিলাম, তাও একটা মানে হত। কুয়োয় পড়া দাঁত তোলার বিদ্যে তো শিখিনি দিদিভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পিসিমা স্বরূপে প্রকটিত হলেন, 'বলি ও অনামুখো অনাছিষ্টি অলপ্পেয়ে, বলি দাঁতটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে না গেলে তুলবি কী করে শুনি? বলি এত নেকাপড়া করেছিস, বুদ্ধিশুদ্ধি কি সেই খোকাটির মতোই রয়ে গেছে, অ্যাঁ। হ্যাঁ রে মিনসে, তোর ডাক্তারের সাট্টিপিট্টি আছে তো? নাকি ভেজাল কাগজের টুকরো দিয়ে আমার মতো সাত চড়ে রা কাড়ে না এমন মানুষের বুকে পা দিয়ে দাড়ি উপড়োচ্ছিস?'

হেমনলিনী বোধহয় এই ব্লিৎজক্রিগ আরও কিছুক্ষণ জারি রাখতেন, যদি না পেছন থেকে গগন মল্লিকের বজ্রনির্ঘোষ ভেসে আসতো, 'এখানে আবার কার ওপর ক্ষেপলে হেমদি?'

এই সসাগরা ধরিত্রীতে হেমনলিনী যদি কাউকে ভয় পান তো গগন মল্লিক। বয়সে হেমনলিনীর থেকে বছর তিনেকের ছোট হলে কী হবে, এই ভারিক্কী চালের ভাইটিকে ছোটবেলা থেকেই রীতিমতো সমীহ করে চলেন তিনি। তিনি হাঁউমাউ করে উঠলেন, 'দেখ না ভাই, এই হতচ্ছাড়া ডাক্তার আমার দাঁত তুলে দিচ্ছে না।'

পুরো কাহিনী শুনে খানিকক্ষণ চারিপাশ কাঁপিয়ে নিজের ট্রেডমার্ক হাসিটা হাসলেন গগনবাবু। তারপর সস্নেহে বললেন, 'বাড়ি যাও দিদি। আমি বছিরুদ্দিকে বলে দিচ্ছি। কাল সকালে গিয়ে তোমার দাঁত তুলে দিয়ে আসবে।'

হেমনলিনী বাড়ির রাস্তা ধরতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গগন মল্লিক। তারপর ফতুয়া'র খুঁটটা দিয়ে চশমাটা মুছতে লাগলেন।

সতীশ ডাক্তার একটা মস্ত শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুব বাঁচা বাঁচালেন মল্লিকদা। নইলে আজই আমার এই গ্রামে ডাক্তারি করা ঘুচে যেত।'

গগন মল্লিক গম্ভীর গলায় বললেন, 'হেমদি ছোটবেলা থেকেই ঝগড়ুটে বটে, তবে ব্রজ মারা যাওয়ার পর থেকেই একটু খ্যাপাটে হয়ে গেছে। অথচ ভালো মেজাজে থাকলে হেমদি'র মতো স্নেহময়ী মানুষ হয় না। ছোটবেলায় কতবার আমার আর আমার বোনের জন্য কোঁচড়ে করে নিজের বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালো ভালো খাওয়ার নিয়ে এসেছে তার লেখাজোখা নেই। আমার নামে কেউ কিছু বললে হেমদিকে দেখেছি গাছকোমর বেঁধে লড়তে নামতে। বহু কষ্টে এমন গ্রামতুতো দিদি পাওয়া হে সতীশ, আমি সত্যিই ভাগ্যবান।'

'সে তো শুনেছি আপনি পড়াশোনায় মারকাটারি ভালো ছিলেন বলে গ্রামের সবাই আপনাকে ভালোবাসতো, তাই।'

'তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল সতীশ। গরিব দুঃখীর বাড়িতে কেউ পড়াশোনা করার চেষ্টা করছে দেখলে দেশ গাঁয়ের মানুষ তার জন্যে যাহক করে এগিয়ে আসতো। এখনও যে আসে না তা নয়, তবে অনেক কম। এই আমার ব্যাপারটাই দেখো না। আমাদের সময় তো মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক এসব ছিল না, ছিল হায়ার সেকেন্ডারি। তার ফী'জ জমা দেওয়ার ডেট চলে যাচ্ছে, অথচ হাতে টাকা নেই। শেষমেশ হেমদি'র মুখে জানতে পেরে হেমদি'র বাবা, মানে যতীনকাকু আমাকে নিয়ে গিয়ে ফী'জ জমা করে এলেন। সে কী বকাবকি আমাকে, ওঁকে আগে জানাইনি কেন?'

গগন মল্লিকের গলাটা ধরে এসেছিল। সতীশ ডাক্তার কিছু বললেন না। গগন মল্লিক এই অঞ্চলের শ্রদ্ধেয় লোক। দিনমজুর পরিবার থেকে নিজের মেধার জোরে উঠে এসে গ্র্যাজুয়েশন অবধি পড়েছেন। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন।

'ব্রজ বলে কার যেন কার একটা নাম নিলেন?'

'ব্রজ হচ্ছে ব্রজনারায়ণ মিত্র, ওরফে বেজা, আমার ছোটবেলার জিগরি দোস্ত। আর হেমদিদি আর ব্রজ হচ্ছে পিঠোপিঠি ভাইবোন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি শোনো।

এই অঞ্চলের এককালের জমিদার ছিলেন মিত্তির ফ্যামিলি। জঙ্গল আর বাঁশবন কেটে তাঁরাই এই ঘুঘুডাঙার পত্তন করেন। তা এই মিত্র বংশেরই বর্তমান বংশধর হচ্ছে ব্রজরা। এখন মিত্তিরদের জমিদারি নেই বটে, তবে জমানো টাকা যা আছে সাত পুরুষে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা ছাড়া ব্যবসাও আছে কিছু টুকিটাকি। গঞ্জের বাজারে ওদের চালকলটা দেখে থাকবে হয়তো। যতীনকাকু ব্যাঙ্কে চাকরি করেছেন অনেকদিন। এখন প্রায় সত্তরের ওপর বয়েস।'

'তা এই ব্রজবাবু মারা গেলেন কী করে?'

'সে এক লম্বা কাহিনী ভায়া। শোনার সময় আছে তোমার?'

'তা আছে বইকি। হেমনলিনীদেবীকে এদিক পানে আসতে দেখে বাকি পেশেন্টরা সেই যে দৌড় দিয়েছে, এক সপ্তাহের আগে এদিক পানে এলে হয়। আপনি বলুন দাদা।'

'ব্রজ ছিল আমার ছোটবেলার একমাত্র বন্ধু, বুঝলে। শুধু বন্ধু নয়, হরিহর আত্মা। অথচ হওয়ার কথা ছিল না। ব্রজ এলাকার বিখ্যাত সম্পন্ন বাড়ির ছেলে, আর আমার দিন আনি দিন খাই অবস্থা। শুধু তাই নয়, স্বভাব চরিত্রেও আমরা একে অন্যের একেবারে উলটো ছিলাম। আমি ছোটবেলা থেকেই লাজুক আর মুখচোরা, আর ব্রজ তেমনই একরোখা গোঁয়ার, আর খুব সাহসী। কী বলবো ভায়া, অমন ডানপিটে ছেলে কমই দেখেছি জীবনে। কতবার যে বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করে মাথা ফাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু কি তাই? মাথায় বিচিত্র সব দুষ্টু বুদ্ধিও খেলত খুব। অন্য ছেলেদের কথা ছেড়েই দাও, স্যারেরাও নাজেহাল হতেন ওকে নিয়ে, লেখাপড়াতে খুব ভালো না হলেও মোটামুটি চলনসই ছিল বেজা, আর ছিল দুর্দান্ত ভালো স্পোর্টসম্যান। তাই আমাদের হেডস্যার উমাশঙ্করবাবু ওকে একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন।

তবে যে বিষয়টায় ব্রজ সত্যিই ভালো ছিল সেটা হচ্ছে ইতিহাস। ওই বয়সেই ভারী ভারী বই পড়তে দেখেছি ওকে। তার মধ্যে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং গল্প মাঝেমধ্যে শোনাতো ও। বলতে বাধা নেই, সেই সূত্রেই আমরা অনেক অজানা কিছু জানতে পারতাম। যেমন ধর খ্রিষ্টধর্মের প্রথম দিককার ইতিহাস, জুলিয়াস সিজারের ব্রিটেন আক্রমণের গল্প, মায়া সভ্যতার গা শিউরে ওঠা কাহিনী, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কথা, মারাঠা বীর শিবাজীর বীরগাথা, মুঘল আমলের রসালো কেচ্ছা, কলকাতার আদিযুগের বিভিন্ন অজানা কাহিনী, এসব ওর থেকেই জেনেছিলাম আমরা।

এহেন ব্রজনারায়ণ হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে উধাও! সে প্রায় পাঁচ ছ'বছর আগেকার ঘটনা। সেই রাতেই যতীনকাকু কোন একটা জমির বায়না করার জন্য লাখ খানেক টাকা ক্যাশ এনেছিলেন। দেখা গেল সেটাও নেই, ব্রজও নেই।

সারা গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। আশেপাশের আরও পাঁচটা গ্রাম, মায় গোটা পরগণা জুড়ে বিশাল উত্তেজনা। কেউ বলছে ব্রজ মাওবাদীদের দলে যোগ দিয়েছে, কেউ বলছে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কেউ বা বলছে বম্বে গেছে হিরো হবে বলে। কাকীমা ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন।

মিত্রদের পরিবার এই এলাকার প্রভাবশালী পরিবার। ফলে পুলিশকে নড়েচড়ে বসতেই হল। কলকাতা থেকে পুলিশের বড় সাহেবরা এলেন, পুলিশের কুকুর অবধি আনা হল। ব্রজ'র বুজুম ফ্রেন্ড হিসেবে আমাকেও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু হতচ্ছাড়া উধাও হওয়ার আগে আমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে যায়নি, ফলে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। পুলিশ আরও অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ব্রজনারায়ণ মিত্তিরের অন্তর্ধান রহস্য রহস্যই থেকে গেল। ধীরে ধীরে সব কিছু থিতিয়ে গিয়ে সবকিছু আগের মতই চলতে লাগল।

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

'ব্রজ ফিরে এল আজ থেকে ঠিক ছ'মাস আগে। তখন সে পুরোপুরি স্যুটেড বুটেড বিলিতি বাবুসাহেব, চেকনাইয়ের জেল্লায় তখন তাকে চেনাই দায়। বোলচাল গেছে পালটে, কথায় কথায় উর্দু বলছে। সারা গ্রামে আবার হুলুস্থুল, তবে আগের মতো না। কাকীমা মারা গেছেন তাও প্রায় বছরদুয়েক হল। যতীনকাকু তো আনন্দে কেঁদেই ফেললেন প্রথমে। তারপর এদিক সেদিক মিলিয়ে কম করে গোটা পঞ্চাশেক মন্দিরে পুজোটুজো দিয়ে সে এক একাকার কাণ্ড।'

'তা এই ব্রজবাবু ফিরে এসে জানালেন তাঁর বাড়ি ছাড়ার কারণ?'

'সে তো জানালই। আরও জানাল এই পাঁচ ছ'বছর কী কী করেছে সে। তার আগে বিষ্ণুচরণের কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

ঘুঘুডাঙার সম্পন্ন ব্যবসায়ী হরিচরণ তিওয়ারির ছেলে হচ্ছে বিষ্ণুচরণ। ইঁটভাটা থেকে শুরু করে সিনেমা হল, তেলকল থেকে শুরু করে পেট্রল পাম্প, ওদের পয়সার লেখাজোখা নেই। আর ওদের টাইটেল তিওয়ারি হলে কী হবে, শ'আড়াই বছর কলকাতায় থেকে ওরা বাঙালিই হয়ে গেছে একেবারে।

পয়সা হলে যা হয়, আমাদের সময়ে বয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝাতো, বিষ্ণুচরণ ছিল তার জ্যান্ত উদাহরণ। ডেঁপোমিতে তার তল পাওয়া দায়। অল্প বয়সেই নেশা করতে শিখেছিল সে, সঙ্গে ছিল হাতটানের অভ্যেস। অমন অসভ্য ইতর বাউন্ডুলে বেহায়া ছোকরা জীবনে কমই দেখেছি।

এই বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ব্রজ'র কী করে যে বন্ধুত্ব হল বলা মুশকিল। তবে দুজনের মধ্যে বেশ গুজুরগুজুর চলত দেখেছি। তবে সেটা কী নিয়ে তখন বুঝিনি। বুঝলাম এতদিন পর।

ব্রজদের জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে, এখন পরিত্যক্ত। তার শিবলিঙ্গটির আকার বিশাল। এককালে দূর দূর থেকে লোকে দেখতে আসত।

সেই শিবলিঙ্গটির মাথায় এককালে তিনটি সোনার পাত আঁটা ছিল। সোনার ত্রিপুণ্ড্রক। আজ থেকে প্রায় একশো বিশ তিরিশ বছর আগে কেউ নাকি সেই সোনার পাত তিনটে চুরি করে নিয়ে পালায়।

ব্রজ বলেছিল, সে নাকি কোনও গতিকে সেই হারানো ত্রিপুণ্ড্রকের খোঁজ পেয়েছে। তার পেছনে নাকি এই বিষ্টুচরণের কোন এক পূর্বপুরুষের লিখে যাওয়া দলিল দস্তাবেজের হদিশ আছে।'

সতীশ ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখানে আবার বিষ্টুচরণ এলেন কোথা থেকে?'

'এলেন ওই পুরোনো দলিলের সূত্রে। চোর নাকি প্রথম দুটো পাত নিয়েই পালাতে পেরেছিল। থার্ডটা নাকি কোনও গতিকে রয়ে যায় বিষ্টুচরণের ওই পূর্বপুরুষের কাছে।'

'সে কী?' ভুরু কুঁচকে যায় সতীশ ডাক্তারের, 'অমন অমূল্য জিনিস, যা নাকি চুরি গেছিল, সেটা কোনও গতিকে বিষ্টুবাবুর পূর্বপুরুষদের কাছে রয়ে যায় কী করে?'

হাত উলটোন গগন মল্লিক, ভ'সে কী করে বলি বলো? বেজা যা বলেছিল সেইটুকুই তোমায় বললাম। তবে এসব অতি গুহ্য কথা। কাউকে বোলো না যেন।'

সতীশ ডাক্তার খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচলে চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'হুম। তা এই করিৎকর্মা মানুষটি মারা গেলেন কী ভাবে?'

'সেটাই তো আশ্চর্যের হে। ব্রজ এসে ঘুঘুডাঙায় ফিরে কিছু সঙ্গীসাথীও জোটায়। পুরোনো আলাপী বিষ্টুচরণ তো ছিলই। যাদের জোটায় তাদের কারও ইতিহাসই যে খুব ধোয়ামোছা তা নয়। খবর আসত মিত্রবাড়িতে মাঝরাতে বিষ্টু আর বেজা'র গোপন মিটিং হচ্ছে। সঙ্গে আরও লোক আসছে যারা এই গাঁয়ের কেউ না। তারা বাইরের লোক। রাতেই আসে, রাতেই চলে যায়। এসবই গোপন খবর। তবে রাজনীতি করেছি বহুদিন, এসব সংবাদ আমার কানে চলে আসেই। জানি না কেন, আমার মনে হয়েছিল ব্রজ'র এখানে ফিরে আসাটা হঠাৎ নয়। এর পিছনে কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে।

আজ থেকে মাস খানেক আগের তেইশ তারিখ, অমাবস্যার রাত। আমি শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ করে বোমা আর গুলির আওয়াজে ঘুঘুডাঙা পুরো কেঁপে উঠল যেন। আমি তো হতভম্ব।

প্রথমে তো মনে হল ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ টুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বুঝি, এমনই দাপট সে বোমাবাজির। একটু সামলে সুমলে উঠে থানার দারোগা ভূপেন আচায্যিকে ফোন করলাম। তিনি তো কেঁপেঝেঁপে অস্থির। তারপর গাঁয়ের আর পাঁচজনকে জুটিয়ে এনে দেখি, ওইদিকে মোড়ের মাথায় যে বটগাছটা, সেখানে গোটাকয়েক লাশ পড়ে। তার মধ্যে একটা আমাদের ব্রজবাবু'র।'

'হুম। এ গল্পটা ভাসাভাসা শুনেছিলাম বটে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল বোধহয়, ঘুঘুডাঙায় গোষ্ঠীসংঘর্ষে চারজন নিহত।'

'হুম। চারজনের মধ্যে দুজন ছিল বাইরের লোক। ব্রজকে বাদ দিয়ে যে আরেকটা লাশ ছিল সেটা গ্রামেরই একটা ছেলের নাম লক্ষ্মণ সামন্ত, আমরা ডাকতাম লখাই বলে। লখাইয়ের নামে মার পিটের অভিযোগ ছিল, শোনা যায় ডাকাতিরও কিছু কেস ছিল ওর নামে। সেদিন রাতে কী যে হয়েছিল বলা মুশকিল। পুলিশ বোধহয় তদন্ত করছে এখনও। তবে রাতের বেলায় লোকে জায়গাটা এড়িয়ে চলছে আজকাল। অপঘাতে মৃত্যু, তাও বটতলায়। বোঝোই তো।'

'তাতে আর ভয় কী। আপনার মতো ডাকাবুকো মানুষ আছেন যখন।'

গগন মল্লিক কাছে ঘেঁষে আসেন, 'দিন কাল ভালো নয় ডাক্তার। চারিদিকের বাতাসে নানান গুজব ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব ফিসফিসানি সবই কানে আসে আমার। ঘুঘুডাঙায় খুব শিগ্গিরি একটা কিছু ঘটতে চলেছে ডাক্তার। খুব সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু।'

সতীশ চাকলাদার গলা নামিয়ে বলেন, 'কী ঘটতে চলেছে মল্লিকদা?'

'ব্রজ নাকি দৈবগতিকে কোনও একটা গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল। সে নাকি অমূল্য জিনিস, টাকার অর্থে তার পরিমাপ হয় না। তার খোঁজেই ব্রজর ঘুঘুডাঙায় ফিরে আসা। কিন্তু সেটা কী, আর কোথায় আছে, কেউ জানে না।'

* * *

রাস্তা দিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে হাঁটছিল ভজন। টাকা পেয়ে সে প্রথমে যতটা খুশি হয়েছিল সেটা উবে গিয়ে এখন বেশ চিন্তা হচ্ছে তার। বাজারে বেশ কিছু কেনাকাটা করেছে সে। বলাবাহুল্য, ভজন নগদ ক্যাশ দিয়ে জিনিসপত্র কিনছে দেখে সব দোকানদারই একটু চমকিত। অনেকেই ঠারেঠোরে জানতে চাইছে ভজন টাকা পেল কোথা থেকে। ভজনও এ কদিনে বেশ শেয়ানা হয়ে গেছে। সে বুঝে গেছে যে সব সত্যি কথা সবাইকে বলতে নেই। তাই সে ইনিয়েবিনিয়ে সব্বাইকে বলেছে যে তার নাকি কোন দূরসম্পর্কের খুড়োমশাই মারা গেছেন, তাঁর উইলে ভজনের নামে কিছু টাকা রাখা ছিল, সেইটেই হাতে এসেছে আর কি।

তবে তাতে সবাই যে বিশ্বাস করছে তা নয়। হরেন গোঁসাই তো বলেই ফেলল, 'তোর আবার দূরসম্পর্কের খুড়ো কোনকালে ছিল রে ভজা? খুড়ো বলতে তো তোর তিনকূলে ওই মাথাপাগলা লখাই সামন্ত ছাড়া আর কাউকে তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।' ভব তালুকদার আবার এর এককাঠি ওপরে, মিষ্টি করে শুধোল, 'অভাবে অনেকেরই অমন বেওয়ারিশ খুড়ো মেসো ইত্যাদি গজাতে দেখেছি রে ভজন। এই তো চাপড়ামারি'র স্বপন খাসনবিশ, এককালে রবিদাস হালুইয়ের মিষ্টির দোকানে কাজ করত। হঠাৎ দেখি গত ভোটের পর কোন পিসেমশাই না তালুইমশাই ধরে লালে লাল হয়ে গেল। এখন তার তিন তিনটে পাঞ্জাব লরি, গঞ্জের বাজারে দু'দুখানা চালকল, তার ওপর শুনছি নাকি প্রমোটারির ব্যবসাতেও নামবে। লোকে আগে ছেনো বলে ডাকতো, এখন বলে স্বপনবাবু। তা তুইও তেমন কোনও খুড়ো পাসনি তো ভজন? খুলে বল ভাই, তাহলে আজ থেকেই ভজনবাবু বলাটা প্র্যাকটিস করি।'

দুপুর এখন বিকেল ছুঁইছুঁই। ঘুঘুডাঙা'র একপাশে সুন্দরী নদীর মরা খাত। এককালে বেশ জল ছিল তাতে, ভজন ছোটবেলায় কাকার হাত ধরে এখানে মাছ ধরতে আসত। এখন সুন্দরী নদী হেজেমজে গেছে। ভজন সেই শুকনো নদীখাত পেরোতে পেরোতে হঠাৎ করে কানের কাছে একটা বিনবিনে স্বর শুনে দাঁড়িয়ে

পড়ল। কে যেন চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলছে, 'অসভ্য, ইতর, বাঁদর, গোমুখ্যু, রাতদিন হাড় মাস কালি করে তোকে মানুষ করেছি এই জন্যই?'

ভজন হাতজোড় করে বলল, 'আর ভয় দেখিও না কাকা। সকালে যা খেল দেখালে তাতেই মাথা তাজ্বিম তাজ্বিম করছে। কী চাও এবার বল তো ঠিক করে।'

কানের কাছে সেই বিনবিনে স্বর এবার মারাত্মক ক্রুদ্ধ, 'হতচ্ছাড়া, নিকম্মার ঢেঁকি, অপদার্থ। ভাবলি কী করে যে সামন্ত পরিবারের ভিটে বিষ্টুচরণের হাতে ছেড়ে দিয়ে পগারপার হবি তুই? তোর একটা মান অপমান বোধ নেই? নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে লজ্জা করবে না তোর?'

ভজন কুঁইকুঁই করে বলল, 'কী করব বল কাকা, আমার আর উপায় আছে কোনও? বিষ্ণুচরণ যে দু'বেলা বাড়ি এসে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে!'

'বিষ্টু'র এত বড় সাহস হয় কী করে তোকে হুমকি দেওয়ার? তাকে মুখের ওপর না করে দিতে পারিসনি?'

'না কাকা, আমার অত সাহস নেই। তা ছাড়া বিষ্টু বলেছে তুমি নাকি বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার নিয়েছিলে। এখন সে টাকা শুধতে পারলে আমি কী করব বল? তুমি বেঁচে থাকলে তাও না হয় একটা কথা ছিল।'

এবার প্রায় কামান গর্জন, 'কী? আমি বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছি? এত বড় মিছে কথা? বিষ্টু হতচ্ছাড়া তাই বলেছে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ডাহা মিথ্যে কথা। আমি মোটেও বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা নিইনি। টাকাটা নিয়েছিলুম হ্যান্ডনোটে। সেটা যে চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে বেড়ে দশ হাজারে দাঁড়াবে সেটাই বা আমি জানব কী করে?'

ভজন হতাশ সুরে বলল,' সে আর এখন বলে কী লাভ, ধার নেওয়ার সময় মনে ছিল না? এখন বিষ্টুচরণ যদি গায়ের জোরে বাড়ি দখল করতে চায় তো আটকাবো কী করে?'

'তাই বলে বাড়ি ছেড়ে পালাবি? হতচ্ছাড়া বেআক্কেলে.... '

ভজন একটু গরম হয়ে বলল, 'দেখো কাকা, বেশি মেজাজ দেখিও না। ধার নিয়েছ তুমি, শুধতে হবে আমাকে, এটা কোথাকার আইন একটু বলবে আমাকে? আর সেটা না পারলে আমারই বা কী দোষ সেটা জানতে পারি কি?'

লখাইয়ের ভূত খানিক ম্রিয়মাণ হয়ে বলল, 'কথাটা অবিশ্যি ঠিকই বলেছিস রে খোকা। তবে কি না..'

তার আগেই ভজন তিক্তস্বরে বলল, 'তোমার ধার তোমারই শোধ করা উচিত ছিল কাকা। এখন তার আগেই ফৌত হয়ে বসে আমার ওপর চোটপাট করে লাভ আছে কিছু? এখন বরং এর থেকে বাঁচার কিছু উপায় থাকলে বল, নইলে আমি কালই চললাম বাড়ি ছেড়ে।'

'ইঃ, ছেলের মেজাজ দেখো একবার। নেহাত বেজাবাবু বললেন তাই আসা। নইলে এত বড় একটা কাণ্ড বাধিয়েছিস সে খবর কি পেতুম?'

'তা সে খবর পেয়ে লাভ আছে কিছু?'

'নইলে আর তোকে বলছি কি। শোন ভজন, তোর সঙ্গে আমার কিছু গোপন শলাপরামর্শ আছে।'

ভজন একবার চারিদিকটা দেখে নিল। এই পড়ন্ত দুপুরে সুন্দরী নদীর চরে দূর দূর অবদি কেউ নেই। সে উদাসমুখে বলল, 'শলাপরামর্শ শোনারও তো একটা খরচা আছে না কী। সকালে যা টাকা পেয়েছিলুম সেসব তো ফুটকড়াই হয়ে গেছে। এবার পরামর্শ'র সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদও ছাড়ো তো দেখি কাকা।'

'হ্যাঁ রে খোকা, তুই আমাদের ভজন তো।'

'এখনও অবধি তো তাই বলেই জানি।'

'বলি সাত চড়ে তো রা কাড়তি না। তোর পেটে পেটে এত শেয়ানা বুদ্ধি গজালো কী করে বল দেখি?'

'পেট খালি থাকলে শেয়ানাবুদ্ধি এমনই গজায় কাকা। সে বাদ্দাও, এখন কাজের কথা থাকলে বলো, নইলে চললাম।'

'আহ, সেটাই তো বলতে এসেছি। মাথা ঠান্ডা করে শোন। বলি আমি কী করে কেন খুন হলাম সে নিয়ে জানিস কিছু?'

'কী করে বলব? আমি কি পুলিশ? তা ছাড়া বেঁচে থাকতে তো তুমি শত্তুরের আর অভাব রাখোনি। ভেবেছি তাদেরই কেউ হয়তো ঠুকে দিয়ে গেছে। ভূপেন দারোগা তো বলেই দিল,' ওরে ভজন, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুই বেঁচেই গেলি বলতে পারিস। লখাই যেমন মারকুটে আর মাথাগরম লোক ছিল, কোনদিন হয়তো দেখলি রেগেমেগে তোর মাথাতেই বসিয়ে দিল এক ঘা। বলি এমন ডেঞ্জারাস এলিমেন্টের সঙ্গে ঘর করার থেকে বরঞ্চ একা থাকাই ভালো, বুঝলি কী না।'

'বটে? ভূপেনর মতো গোমুখ্যুটার কথা শুনে বুঝি তুইও সেটাই সত্যি বলে মেনে নিলি? ওরে ছাগল, বলি আমার লাশের পাশে বেজাবাবুর মতো অমন মস্ত মানুষের লাশ, সে দেখেও তোদের কিছু মনে হল না?'

ভজন হাত উলটে বলল, 'মনে হয়েই বা আমার লাভ কী? তখন কি আমার মাথার ঠিক আছে কাকা? একদিকে লোকে বলছে তোর খুড়ো ভালো মানুষ ছিল না কী না, তাই কেউ ঠুসে দিয়ে গেছে। এদিকে পুলিশ বলছে ঝটপট লাশ জ্বালিয়ে দে ভজন, নইলে পরে হাঙ্গামা হবে। আমার হাতে তেমন পয়সাও নেই যে তোমার দাহকার্য করতে পারব। তখন শেষমেশ ওই বিষ্টুচরণ নিজে এগিয়ে না এলে হয়তো তোমার দাহকার্য শ্রাদ্ধশান্তি এসবের কিছুই হত না। আর ব্রজবাবুর খুন নিয়ে হাঙ্গামা কেন হয়নি সে মিত্তিরবাড়িই বলতে পারবে।'

'নাহ, যেমন ভোঁদাই ছিলিস তেমনই আছিস রে ভজন। সে অবশ্য একদিক থেকে ভালোই। তবে সে যাই হোক, এবার কাজের কথাটা মন দিয়ে শোন দিকি। আজ বাড়ি ফিরে আমার ঘরে ঢুকবি, বুঝলি। তারপর ঠাকুরের সিংহাসনের কাছে দাঁড়াবি। তারপর সিংহাসন সরিয়ে দেখবি...'

'ওসব বহু আগেই দেখা আছে কাকা। সামনে এগোও।'

'অ্যাঁ? তার মানে আমার ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে আগেই ঢুকেছিস তুই? তোকে না পই পই করে আমার ঘরে ঢুকতে মানা করেছিলাম? তোর তো দেখছি সাহস কম না ভজু?'

ভজন তেরিয়া হয়ে বলল, 'তা তুমি ড্যাং ড্যাং করে ফৌত হওয়ার আগে কি ভেবেছিলে আমার কী হবে? কোথায় কী টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছ সেসব জানবো কী করে আমি? ওই জন্যেই তো তোমার ঘরে কিছু ছানবিন করতে গিয়েই সিংহাসনের নীচে ওই গর্তটার খোঁজ পেলাম।'

'ওরে শালা রে! তা সেই গর্তের মধ্যে কী পেলি তুই?'

'দেখো কাকা, একদম গালমন্দ করবে না। সোজা কথা সোজাভাবে বল। গর্তের মধ্যে পেলাস্টিকে মোড়া একটা ছোট বইমতো ছিল। তুমি সেটার কথাই বলছ তো?'

'ওরে বাবা রে! আমি কোথায় যাব রে! এ তো একেবারে মানুষ হয়ে উঠেছে দেখছি। জয় গৌর নেতাই, জয় কালী করালবদনী, জয় অঘোরীশম্ভু, ওগো তোমরা কে কোথায় আছ...দৌড়ে এসে দেখ, আমাদের ভজন যে একেবারে ডাকাবুকো মানুষ হয়ে পড়ল যে গো!'

ভজন কঠিনস্বরে বলল, 'দেখ কাকা, ফালতু নাটক কোরো না। ওটা যে এমনি এমনি লুকিয়ে রাখোনি সে আমি বেশ বুঝেছি। এবার বলো ওটা নিয়ে করতে হবেটা কী।'

'ওরে আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, চোখের মণি, বুকের পাঁজর...'

'আহ কাকা, হচ্ছেটা কী? বড় হয়েছি তো না কি? শোনো, আগেই বলে দিচ্ছি এসব ফালতু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, কিছু নগদ খসাতে হবে তোমাকে। কাজটা কী খোলসা করে বল দিকি, আর জলদি কিছু টাকাপয়সা ছাড়ো।'

'আহা, সোনামাণিক আমার। টাকার ব্যাপারে কি না করেছি রে ভজু? তবে কথা হচ্ছে কী না, ওই ডায়েরিটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে, বুঝলি। বিষ্টুচরণ যেন কিছুতেই ওটার খোঁজ না পায়।'

'কেন? তাতে এমন কী আছে শুনি?'

'কারণ আছে রে ভজন, মস্ত কারণ আছে। ওটার জন্যই তো এত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। তুই কী জানিস, বিষ্টুচরণও ওটার লোভেই তো লোক লাগিয়ে আমাকে আর বেজাবাবুকে খুন করেছে?'

ভজন খানিকক্ষণ গভীরভাবে ভেবে বলল, 'সেটা আমি অনেকটাই আন্দাজ করেছিলুম কাকা। তার ওপর অনেকেই ঠারেঠোরে সে কথা আমাকে বলেছে বটে। কিন্তু ভূপেন দারোগা তো সেসব কিছুই মানতে চায়নি। তার ওপর আমাকে বলে কী না এই নিয়ে বেশি হম্বিতম্বি করলে আমাকেই নাকি সোজা ফাটকে পুরে দেবে।'

'বলিস কী ভজন? ভূপেনর এত বড় সাহস হয়েছে?'

'সাহস বলে সাহস? সে তো আমাকে এও বলল, 'লখাইয়ের সঙ্গে যা হয়েছে সেসব ভুলে যা ভজন। এসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করিসনি। তোর ইয়াং ব্লাড, যাকে বলে একেবারে বয়েলিং। এসব পেছনে ফেলে লাইফটা নতুনভাবে শুরু কর, বুঝলি।'

'হুম। বুঝছি। খুব নতুন ভাবেই বুঝছি রে ভজন। ভূপেনের সঙ্গে একবার দেখা না করলেই নয়।'

'কিন্তু তুমি একটা কথা বলো কাকা, এক্ষেত্রে ডায়েরিটা বিষ্টুচরণের হাতেই তুলে দেওয়াটাই আমার পক্ষে ভালো নয় কী? তাতে হয়তো সে খুশি হয়ে বাড়িটার ওপর তার দাবি ছেড়েই দিল, চাই কী তার ওপর কিছু নগদও হয়তো হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। তাতে ক্ষতি কী কাকা? আমি তো বরং লাভের পাল্লাটাই ভারী দেখছি।'

'হে হে হে। তোর কী ধারণা বিষ্টু ওই ডায়েরি পেলে তোকে আর বাঁচিয়ে রাখবে রে ভজন? সে গুড়ে বালি। বিষ্টু এসবের সাক্ষী রাখবেই না। ডায়েরিটা পেয়েই তোকে গলা কেটে ডাইনিজলার জঙ্গলে পুঁতে রেখে আসবে। কিংবা হয়তো গ্যাঁড়াপোতার জঙ্গলে জ্বালিয়েই দিল, কে বলতে পারে?'

ভজন চুপ করে রইল। কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে বটে।

'শোন বাপধন আমার, ওসব গোখখুরিতে যাসনি। তার চেয়ে বরং মাথা ঠান্ডা করে আমার কথাটা শোন।

ওই ডায়েরিতে অনেক টাকাপয়সার হদিশ আছে বুঝলি? টাকার পরিমাপে তার ইয়ত্তা হয় না। সে সব হল গে মিত্তির পরিবারের পূর্বপুরুষদের জমানো গুপ্তধন। আর আমাদের বেজাবাবু নাকি সেটারই খোঁজ পেয়েছিল।'

'আরিব্বাস! বলো কী কাকা? এসব কি সত্যি?'

'ভূতেদের আজ অবধি কখনও মিথ্যে বলতে শুনেছিস?'

ভজন ভারী অভিমানভরে বলল, 'কাকা, তোমার কী মনে হয় আমি দিনমানে নেত্যই ভূতেদের সঙ্গে বিবিধ রসালাপ করে থাকি?'

'আহা, আমি কী তাই বলেছি রে পাগল? আমি তো বরং সদাসর্বদাই ভূতেদের সঙ্গে রসালাপ করাটাকে খুব সাঙ্ঘাতিক বলেই মেনে থাকি, বুঝলি কী না। আমি বেঁচে থাকলে তো তোকে ভূতেদের সঙ্গে আলাপ করতে বারণই করে দিতাম।'

'আহা, কী কথাটাই না শোনালে কাকা। দিল একেবারে তররর হয়ে গেল।'

'কথাটার মধ্যে কি কিছু প্যাঁচ আছে রে ভজন?'

'হে হে হে, সে আছে বটে, কিন্তু সে বাদ দাও। এখন কাজের কথা বল তো কাকা, সে গুপ্তধন আছেটা কোথায়?

'বললাম তো, মিত্তির বাড়ির গুমঘরে।'

'সে গুমঘরের কথা তো গল্পেই শুনেছি কাকা, তার খোঁজ কেউ পেয়েছে বলে তো জানা নেই।'

'সেটাই তো তোকে জানতে হবে রে ভজন, বেজাবাবুর ডায়েরিতে নাকি সেই গুমঘরের খোঁজই রয়েছে। আর ডায়েরির সংকেত অনুযায়ী সেই গুপ্তধন তোকেই খুঁজে বার করতে হবে।'

ভজনের গা' টা খানিক শিউরে উঠল। সে বুঝতে পারল যে তার ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু লখাইয়ের কথা এখনও শেষ হয়নি।

'আর শোন লখাই, এ কিন্তু সহজ রাস্তা নয়। পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। তবে সেসব যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কাটিয়ে দিতে পারিস, তবে আর চিন্তা নেই।'

বিপদের কথা শুনে ভজনের গলাটা শুকিয়ে গেল। কোনওরকমে সে বলল, 'কিন্তু কাকা, বিপদ এলে কী করব?'

ফের ঝাঁঝিয়ে উঠল সেই কণ্ঠস্বর, 'ছেলের কথা শোনো। মনে হয় এক্ষুনি ঘেঁটি ধরে গঙ্গায় চুবিয়ে আনি। বিপদ এলে বাঘের বাচ্চার মতো লড়বি, বুঝলি, খবরদার পালাবি না, তাহলে বুঝব হ্যাঁ, সামন্ত পরিবারে একটা বাঘের বাচ্চা জন্মেছিল বটে।'

এই এক কথাতেই ভজনের ভীতু ভাবটা একেবারে কেটে গেল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কী করতে হবে সেটা এবার খুলে বল তো কাকা।'

লখাই সামন্ত ভারি খুশি হয়ে বলল, 'শাব্বাস এই তো চাই। শোন খোকা, আমি আর বেজাবাবু তোর পেছনেই আছি, তার নমুনা তো দেখেইছিস। বাকিগুলোও ক্রমে ক্রমে হবে। যা হবে সেসব তোর ভালোর জন্যই হবে। তাতে কিন্তু ভয় পাস না। মনে রাখিস ওই গুপ্তধন কিন্তু তোকেই উদ্ধার করতে হবে, বুঝলি?'

'বুঝলাম কাকা।'

ভজনের মনে হল একটা দমকা হাওয়া যেন একবার তাকে পাক মেরেই সাঁই করে ওপরে উঠে গেল।

* * *

সন্ধেবেলা ঘরে এসে তোলা উনুনে ভাত বসিয়েছিল ভজন। মাসখানেক হল এ বাড়িতে উনুনে আগুন পড়েনি। চেয়েচিন্তে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই পেট ভরিয়েছে সে। তাই কাঠকুটো আর ঘুঁটের ধোঁয়াতে চোখে জল আসছিল ভজনের। তবে সেটা শুধু ধোঁওয়া নয়, অন্য কারণেও হতে পারে।

আয়োজন অবশ্য সামান্যই। সেদ্ধ ফ্যানাভাত, আলু সিদ্ধ, হাঁসের ডিম সিদ্ধ, নুন আর কাঁচালঙ্কা। অনেকদিন হল ডিমসিদ্ধ খায়নি ভজন। শুধু ডিম কেন, আমিষ খেয়েছে সেও প্রায় মাস দুয়েক হল। ভাবতে ভাবতেই জিভ থেকে দুটো ফোঁটা নতুন কেনা লুঙ্গিতে এসে পড়ল ভজনের। ভাত হয়ে গেছে বুঝে হাঁড়িটা উনুন থেকে নামাতে নামাতেই ভজন বুঝল যে টাগরা থেকে জিভের ডগা অবধি একটা খাই খাই ভাব উঠে আসছে। আর সে আসছে মানে তো আসছেই, বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে বাঁধ মানানো যাচ্ছে না। গলাটলা খাঁকড়ে নিজেকে বেশ ভারি গলায় তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলে প্রবোধ দিল ভজন। তবে খাই খাই ব্যাপারটা সেই প্রবোধে তেমন আমল দিল বলে মনে হল না। এটা আগেও লক্ষ্য করেছে ভজন, খিদে ব্যাপারটা এসব ভারিক্কি শ্লোকটোককে তেমন পাত্তা টাত্তা দেয় না।

ভাতের ফ্যান গালার জন্য উঠতে যাবে ভজন, তখন সে খেয়াল করল যে ঘাড়ের কাছটা অজানতেই বেশ দপদপ করছে তার।

ভজন ভাবল হতেই পারে। দিনভর তো আর কম হুজ্জোত যায়নি তার ওপর দিয়ে। ঘাড়ে মুখে একটু জল দিয়ে আসলে যদি মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়।

কুয়ো থেকে জল তুলে ঘাড়ে মুখে ছিটিয়ে মুছে নিল ভজন। আশ্বিনের আকাশ, সবে মহালয়া গেছে। আকাশে শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ বেশ ঝকঝক করছে। সেদিকে আলোয় চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল ভজন, আর তখনই বেড়ার দিকে নজর গেল তার।

পুবদিকের করবীগাছটা তার নিজের জায়গায় নেই। সেটা প্রায় দু-হাত মতো সরে গেছে, তার গা ঘেঁষে এসেছে কাগজিলেবুর গাছটা।

এককালে ভজনের আতাক্যালানে বলে পাড়ায় নাম ছিল বটে, তবে সে ভজন আর এ ভজন নয়। সে বুঝে গেল এসব অশৈলী কাজকারবারের পেছনের কারণটা। কাকাকে বলেছিল বটে টাকার কথাটা। তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে...

দুরুদুরু বুকে করবী গাছটার দিকে এগিয়ে গেল ভজন।

ওদের বাড়িটা পাড়ার একদম শেষ ভাগে। এদিকপানে হুট করে কেউ আসে টাসে না। তাও একবার চারিদিক তাকিয়ে নিল ভজন। আর তারপর করবী গাছের কাছে এসে দাঁড়াতেই মাটিতে পড়ে থাকা মানিব্যাগটা হালকা চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল তার।

বাবার মানিব্যাগটা না?

হাতে নিয়ে ভজন বুঝল যে তার অনুমানই ঠিক। বাবার সেই ফাটা ময়লা মানিব্যাগটাই বটে। তফাতের মধ্যে সেটার মধ্যে কয়েকটা জরুরি কাগজ ছাড়া কোনওদিনই বিশেষ কিছু থাকত না। এখন সেটা বিস্তর পেটমোটা।

ঘরে এসে কুপিটা একটু উসকে দিল ভজন। তারপর মানিব্যাগটা খুলল। দু-হাজার টাকার পঁচিশটা নোট। মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

হিসেব মতো এরপর ভজনের মূর্ছা যাওয়ার কথা। কিন্তু সে জানে এসব কেন হচ্ছে। তাই মাথাটাথা ঘুরলেও মোটামুটি সামলে নিল সে। মানিব্যাগটা একটা পুরোনো কার্ডবোর্ডের বাক্স'র ভিতর রেখে ঝটপট খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভজন জানতেও পারল না যে তার বাড়ির উলটোদিকের অশ্বত্থ গাছে চড়ে, সর্বাঙ্গে কালো চাদরে মোড়া একটা লোক তার বাড়ির দিকে নজর রাখছিল। ভজন ঘুমিয়ে পড়তেই হাতের শক্তিশালী বাইনোকুলারটা গুটিয়ে ফেরার পথ ধরল সে।

* * *

বিষ্ণুচরণ দশ হাজার টাকা বাক্সে ঢুকিয়ে মধুর হেসে বলল, ''আমি জানতামই যে ভজন একেবারে ওয়ান নাম্বারের অনেস্ট ছেলে, টাকা মারার বান্দাই নয়। ওরে কে আছিস, ভজনের জন্য গুড কোয়ালিটি টী নিয়ে আয়, ভজন কী আমাদের পর রে? সেই চিলড্রেনস ডে থেকে ওকে দেখছি।''

ভজনের গায়ে সদ্য কেনা টি শার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট। পায়ে নতুন হাওয়াই চপ্পল। এই দুদিনে তার চেহারার চেকনাই পালটে গেছে একেবারে। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে একটা সুরুরর শব্দ তুলে সে বলল, 'আগের দিনের কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিই বিষ্ণুবাবু। সুবিধা অসুবিধা মানুষের থাকেই, এই নিয়েই তো সংসার। তবে তাই বলে কারও বাড়ি গিয়ে চড়াও হয়ে অপমান করাটা কিন্তু কোনও কাজের কথা না।'

বিষ্ণুচরণ খানিক হেঁ হেঁ করে হেসে বলল, 'আসলে দিনকাল তো ভালো না, তাই একটু সফট ওয়েতে মনে করিয়ে দেওয়া আর কি। তা তোর তো মনে হচ্ছে লাক ওপেন হয়ে গেছে রে ভজন। কী ব্যাপার, কোনও সিক্রেট ট্রেজার হাতে এল নাকি?'

ভজন চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, তার হাতটা সামান্য কেঁপে গেল। তবুও জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আরে না না, গুপ্তধন টুপ্তধন কিছু নয়। সামতাবেড়েতে আমার এক দূরসম্পর্কের খুড়োমশাই মারা গেছেন কী না। তাঁর উইলে নাকি আমার নামে কিছু টাকা রাখা ছিল, সেইটেই হাতে এসেছে আর কি। তবে বেশি না, পেয়েছিলাম অল্পই। তার আবার সবটাই আপনাকে দিয়ে গেলাম।'

বিষ্ণুচরণ মাছি তাড়ানোর মতো করে কথাটা উড়িয়ে দিল। একটু খুক খুক করে হেসে বলল, 'সেসব নিউজ অলরেডি কানে চলে এসেছে রে ভজন। সেই থেকেই তো ভাবছি, আমাদের কেন এমন আক্কেল হয়

না বল দেখি।'

ভজন একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'আসলে খুড়োমশাইরাও আজকাল ভাইপো দেখে জন্মাচ্ছেন কী না, সেই জন্যই হয়তো ব্যাপারটা মিস হয়ে গেছে।'

বিষ্ণুচরণ একটু ব্যাঁকা হেসে বলল, 'সে তো লখাইকে দেখেই বুঝেছি। তা আজ কী পেয়ারাগাছের গোড়া থেকেই মোহরের থলেটা বেরোবে নাকি রে ভজন? নাকি কাগজিলেবু গাছটার ওপরেই নোটিশ রাখতে হবে বলছিস?'

এমনিতেই লোকটার হাবভাব ভালো ঠেকছিল না ভজনের। শেষের কথাটা শোনামাত্র তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল সে। হাতজোড় করে বলল, 'তাহলে আজ উঠি বিষ্ণুবাবু। টাকাটা তো পেয়েই গেলেন, আশা করি এরপর আর ওদিক পানে যাওয়ার দরকার হবে না আপনার। আর হ্যাঁ, দরকারে সময় বড় সাহায্য করেছিলেন, এই উপকারটুকু মনে রাখব।'

ভজন চলে যাওয়ার পর করিম আর হরেকৃষ্ণকে কাছে ডাকল বিষ্ণুচরণ। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'গনু চোর কী বলল? ভজন টাকা পাচ্ছে কোথায়?'

করিম মাথা চুলকে বলল, 'গনু তো বলল ও ভজনকে দেখেছে বাগিচামে কী একটা পেড়ের নীচে থেকে টাকাটা কুড়িয়ে নিতে। কিন্তু টাকাটা কী করে ওখানে এল সেটা ও ঠিক বলতে ইয়াদ করতে পারছে না।'

বিষ্ণুচরণ মধুর হাসিতে ভুবন ভরিয়ে বলল, 'হতেই পারে, তোর মতো অকালকুষ্মাণ্ড যখন আমার কাছারি এনলাইটেন করে থাকতে পারে, তখন গাছেরই বা টাকা বিয়োতে দোষ কী, তাই না রে করিম?'

করিম বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'এ কথাটাও তো সচ-ই লাগছে হুজুর।'

বিষ্ণুচরণের হাতের কাছে একটা সুপুরি কাটার জাঁতি ছিল। সেইটে টিপ করে করিমের রগের দিকে ছুঁড়ে চ্যাঁচাতে লাগল 'হতচ্ছাড়া বেল্লিক বেয়াদব স্কাউড্রেল ইডিয়ট স্টুপিড মাথামোটা স্কন্দকাটা কোথাকার। এক্ষুনি দূর হ চোখের সামনে থেকে। ফের যদি তোকে আশেপাশে দেখেছি, ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেব।'

করিম ''আইব্বাপ রে'' করে একলাফে বৈঠকখানার বাইরে গিয়ে পড়ল। তারপর চোঁ চাঁ দৌড়। সেদিকে তাকিয়ে হরেকৃষ্ণ ভারী দুঃখিত মুখে বলল, 'কথাটা কিন্তু ঠিক বললেন না কর্তা।'

লাল চোখ এদিকে ঘুরিয়ে বিষ্ণুচরণ বলল, 'কোন কথাটা?'

'করিম যদি কন্দকাটাই হবে তাহলে ওর মাথামোটা হয়ে লাভ কী, মানে মাথাই যখন আর থাকছে না? আর মাথামোটাই যদি হবে তো ওকে কন্দকাটা হওয়ার কী মানে?'

বিষ্ণুচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল গদাইয়ের দিকে। তারপর খুব ঠান্ডা স্বরে বলল, 'জাঁতিটা একটু কুড়িয়ে এনে দিবি হরে?'

'কেন কর্তা?''

'আগের বারে টার্গেট মিস করেছি। এবারে আর করতে চাই না।'

হরেকৃষ্ণও আইব্বাপ করে লম্বা দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই বিষ্ণুচরণ বাঘের থাবায় তাকে পেড়ে ফেলে বলল, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোদের দুটোকেই সুন্দরীর চরে পুঁতে দিয়ে আসি, তাতে যদি আমার অ্যাঙ্গার কিছুটা মেটে।'

হরেকৃষ্ণ চিঁ চিঁ করছিল, তাকে ছেড়ে দিল বিষ্ণুচরণ। তারপর একটা বাঘাটে গলায় বললেন, 'বাকি কাজ যা বলেছিলাম তার কী হল? সব রেডি?'

* * *

দশাসই শরীরটা ল্যাঙট পরে ঘুঘুডাঙা থানার বারান্দায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। একটা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক সেই পাহাড় প্রমাণ লাশ দলাই মলাই করতে পা টিপতে টিপতে মৃদু সুরে বলল, 'কত্তা, ঘুমোলেন নাকি?'

ভূপেন দারোগা আরামের আবেশে একটা ঘঁৎ করলেন প্রথমে। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'তোর হাতখানা ভাবছি এবার সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব রে গনু, তুই হলি একজন সত্যিকারের শিল্পী, বুঝলি?'

গনু একটু লজ্জা পেল প্রথমে, 'তারপর বলল, ''শিল্পীর ব্যাপারটা কিন্তু খুব একটা ভুল বলেননি কত্তা। এই তো সেদিন পোড়াপীরতলায় জয়নাল চাচা'র বাড়িতে রাত্তিরে ঢুকেছি। খবর ছিল যে মেয়ের বিয়ের জন্য চাচা এক লাখ টাকা এনে রান্নাঘরের বাতায় ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি যেই না তালাটি খুলে রান্নাঘরে ঢুকেছি, দেখি চাচা মেঝেতে সটান হয়ে বসে জুলজুল করে আমার দিকেই চেয়ে। আমি তো পালিয়ে বাঁচি না। চাচাই আমাকে ডেকে আদর টাদর করে বললেন, 'ওরে পাগল, এককালে গোটা হুগলি জেলায় জয়নাল চোরের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। সকালে যখন মুনিশ খাটার নাম করে সব দেখতে এসেছিলিস তখনই তোকে লক্ষ করেছি। তবে হ্যাঁ, তোর এলেম আছে বটে। অমন উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে নামলি, বিন্দুমাত্র আওয়াজ হল না। আমার বাড়ি ভর্তি লোক, তিন তিনটে সা জোয়ান মরদ ছেলে, দু'দুখানা কাজের লোক কেউ টের পেল না বাড়িতে চোর ঢুকেছে। আমি অবশ্য জানতুম তুই আসবি। সেই থেকে এখানেই বসে আছি। আয় বাছা আয় দেখি। জয়নাল শেখ শিল্পীর মর্যাদা দিতে জানে। পোস্তবাটা আর লঙ্কাপোড়া দিয়ে দুটো আমানি খেয়ে যা দিকি।' শুধু কি তাই, যত্ন করে একটা সুলেইমানি ভূতবন্ধন মন্ত্র অবধি শিখিয়ে দিলেন।'



ভুপেন দারোগা একটু ব্যথিত মুখে বললেন, 'এই সাত সকালে হতচ্ছাড়াটার নাম না নিলে কি তোর চলছিল না ভজন? জানিস, এককালে জয়নাল চোরের জন্য তিন তিন খানা থানার দারোগা একসঙ্গে বদলি হয়ে গেছিল? আমার আগে যে দারোগাবাবু এসেছিলেন চিন্তায় চিন্তায় তাঁর বিশ কেজি ওজন কমে গেছিল? আর তারপর একদিন বড় কর্তার সামনে স্যালুট ঠুকতে গিয়ে কোমর থেকে প্যান্ট খুলে গিয়ে সে কী কেচ্ছা কেলেঙ্কারি?'

গনু একটু একটু দলাই মলাইয়ের স্পীড বাড়িয়ে দিল। ভূপেন দারোগা ফের আবেশে চোখ বুজে ফেললেন।

গনু একটু পর ফের মৃদুস্বরে বলল, 'কত্তা, শুনছেন?'

'গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে বাকি যা বলার ঝট করে বলে ফেল গনু। ভূপেন দারোগা ঘুমোলেও চোখ কান সব সজাগ থাকে।'

'বলছি আপনি আমাদের ভজন সামন্তকে চেনেন তো?'

'ওই লখাইয়ের অপোগণ্ড ভাইপোটা তো? খুব চিনি। অমন হদ্দ কুঁড়ের বাদশা কমই হয়।'

'তার যে চালচলন পালটে গেছে, সে খবরটা পেয়েছেন কি?'

'কীরকম? ছোকরার নামে তো কোনওদিন বেচাল কিছু শুনিনি।'

'আমাদের বিষ্টুদার কাছ থেকে লখাই কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। সে টাকা সুদে আসলে দাঁড়িয়েছিল দশ হাজারে। তা লখাই ফৌত হওয়ার পর বিষ্টুদা গিয়ে ভজনকে বলল, হয় টাকা দাও না হয় বাড়ি ছাড়।'

'খাতকের ধার কি সে মারা গেলে তার ভাইপোর ওপর অর্শায় রে গনু? আমি আবার আইনের ব্যাপারটা ভালো জানি না।'

'হে হে হে। আপনি কিন্তু ভারি মজা কথা বলেন কত্তা। এই তো সেদিন মনসাপোঁতার নিতাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। চেনেন তো কত্তা? শিয়ালদা চন্ননগর লাইনের ফেমাস গ্যাঁড়াবাজ। লোকের পকেট থেকে মানিব্যাগ গ্যাঁড়াতে ওর জুড়ি নেই। নিতাই তো আপনার নাম শুনে হেসেই খুন। বলে তোদের দারোগাবাবু ভারি মজার মানুষ রে গনু। দেখলেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।'

'বাজে বকা'র একটা সীমা থাকে গনু। নিতাইকে বলে দিস পরেরবার যদি ওকে হাতের কাছে পাই তো পিটিয়ে সুন্দরীর চরে জ্যান্ত পুঁতে দিয়ে আসব। আমারই পকেট মেরে সেই টাকায় পাঁঠার মাংস কিনে ফিস্টি দেয় হতচ্ছাড়া? এত বড় সাহস?'

'এ হে হে হে। নরম জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেললাম নাকি কত্তা? বাদ দিন। আর আইনের কথা আবার কি? এই এলাকায় আপনার কথাই আইন, আপনার থানাই আদালত। এই তো সেদিন জয়হরি মুখুজ্জে বলেই ফেললেন...'

'আহ, এসব ফালতু কথা ছেড়ে কাজের কথাটা বলবি?'

'হেঁ হেঁ হেঁ.. তা সে কথাই তো বলছিলুম। তা বিষ্টুদা কিন্তু অন্যায্য কিছু বলেছেন কি কত্তা? তাঁরও তো অনেক কষ্টের টাকা, রক্ত মুখে তুলে উপার্জন করা টাকা, সেসব দানছত্তর করে দিলে চলবে কী করে বলুন তো?'

'হুম তারপর?'

'ভজনটার আস্পদ্দা দেখুন, সে কী না বিষ্টুদা'র সেই টাকাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গ্যাঁটম্যাট করে বেরিয়ে এল?'

মাথাটা এদিকে ঘুরিয়ে সামান্য উঠে বসলেন ভূপেন দারোগা, 'বলিস কী রে গনু? এক লপ্তে দশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিল ভজন? অত টাকা পেল কোথায় ছোঁড়া?'

'সেটাই তো কথা কত্তা। ভজন চাদ্দিকে বলে বেড়াচ্ছে তার নাকি কোন না কোনও খুড়ো পটল তুলেছে, আর তাতে নাকি মেলা টাকাপয়সা পেয়েছে সে। তার তো চালচলনই পালটে গেছে কত্তা। পরনে নতুন জামা, নতুন জুতো। মশমশ করে হাঁটে, মুখখানা গেরাম্ভারি করে ইদিকে উদিকে চায়। সেদিন আবার হারাণ নাপিতের কাছে ক্ষৌরি হয়ে আট টাকার ওপর দু'টাকা বকশিশ অবধি দিয়েছে।'

আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন ভূপেন দারোগা, 'বলিস কী রে? ভজনের এত উন্নতি হয়েছে? একবার দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা।'

'তবে আর বলছি কি কত্তা। সাপের পাঁচ পা দেখেছে বললেই হয়। সেদিনই তো রাখাল সাধুখাঁ'র সঙ্গে দেখা। সে তো বলল বাজারে জোর গুজব, ভজন নাকি কোন ডাকাতদলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কে নাকি ভজনকে দেখেছে অমাবস্যার রাতে একটা মস্ত খাঁড়া হাতে কুমোরহাটির জঙ্গলে সেঁধুতে।'

'বটে? সাধুখাঁ অবশ্য তেমন সাধুপুরুষ কিছু নয়। আশায় আছি লোকটা একদিন মিথ্যে কথার কম্পিটিশনে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করবে। কিন্তু প্রশ্নটা যে থেকেই যাচ্ছে রে গনু। ভজনা এত টাকা পেল কোথায়?'

গনু কিছু বলার আগেই থানার হাবিলদার হুকুমচন্দ সিং দৌড়ে এসে খবর দিলো, 'কলকাত্তা সে দো সাহাবলোগ আঁয়ে হ্যায়।'

অলস মন্থর ভঙ্গিতে উঠে পড়লেন ভূপেন দারোগা, 'ভেতরে নিয়ে বসা। আমি স্নানটা সেরেই আসছি।'

* * *

ভূপেন দারোগা স্নান করেন ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে। তাতে অসুবিধা নেই, অসুবিধা হচ্ছে সেই সঙ্গে তিনি তারস্বরে শ্যামাসংগীত গাইতে থাকেন। ওই আধঘণ্টা ঘুঘুডাঙার লোকজন পারতপক্ষে থানার দিক মাড়ায় না। থানার দুই হাবিলদার হুকুমচন্দ এবং হরগোবিন্দ, সেকেন্ড অফিসার রতনলাল খাসনবিশ আর রান্নার লোক নুরু মিঞা কানে আঙুল দিয়ে ইষ্টনাম জপতে থাকেন। এমনকি লোকে নাকি সেই সময় ঘুঘুডাঙা থানার রেসিডেন্ট বেড়াল দধিমুখি আর পোষা ধেড়ে ইঁদুর কালনেমিকে থানার দেওয়ালের ওপর পাশাপাশি চুপটি করে বসে থাকতে অবধি দেখেছে।

আজ ভূপেন দারোগা গাইছিলেন, 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো।' চারিদিকের বাতাস সেই গানের গুঁতোয় আঁতকে আঁতকে উঠছিল। নুরুল ইসলাম তার ভ্যান নিয়ে বাজারে যাচ্ছিল। 'শ্যামা' শোনামাত্র সে ভ্যানটা থানার দেওয়ালে ঠেকিয়ে দে দৌড়। রামভজন গোয়ালা তার জরু'র নামে কী একটা নালিশ করতে আসছিল। গানের গমকের প্রথম টানেই সে মাটি নিয়েছে, তার আর ওঠার নামলক্ষণ নেই। নরহরি চক্কোত্তি এই রাস্তা দিয়েই তাঁর যজমানকে গ্যাঁড়াপোতার ওয়ার্ল্ড ফেমাস নেত্যকালী মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, একটা মানতের পূজা সাঙ্গ করতে। সামান্য খানিক শুনেই সেই যে লম্বা দিয়েছেন, তাঁর আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। যজমান অখিল সমাদ্দার দাঁত ছরকুটে থানার সামনে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন, তাঁকে তোলবার কেউ নেই। থানার চৌহদ্দির পাশেই পান্তীর মাঠ। তার পাশে একটা তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা তালগাছ আছে। ঘুঘুডাঙার নেড়িদের অবিসংবাদী লীডার কুমার বাঘা সেই তালগাছটার নীচে চার পা তুলে শুয়ে। তাকে ঘিরে বাকি নেড়িরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছে। এইমাত্র তালগাছের ডগা থেকে ভূপেন দারোগার গানের গুণমুগ্ধ একটি কাক টুপ করে খসে পড়ল। শুধু থানার পাশের বাড়ির বিধবা পিসিমা রঙ্কিণীদেবী কানে শোনেন না, তিনি রোজকার মতো ছাত ঝাঁট দিতে এসে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'রোজই তো এই সময়ে দিব্যি কালোয়াতি শুনতে পাই। তবুও যে অলম্বুষগুলো কেন যে বলে কানে শুনতে পাই না বুঝি না।'

গান শেষ হতে ভূপেন দারোগা প্রসন্ন মুখে গামছা দিয়ে গাত্রমার্জনা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে চারদিক স্বাভাবিক হয়ে এল। প্রসন্ন মলয় সমীরণ বইতে লাগল, মাঠে সবৎস ধেনু চরতে লাগল, রামভজন জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে থানার বারান্দায় এসে বসল। নরহরি চক্কোত্তি তাঁর যজমান নিয়ে গেলেন,

নুরুল ইসলাম তার ভ্যান। বাঘা আর তার সঙ্গীরা সোল্লাসে ঘেউ ঘেউ করতে করতে দৌড় দিল। শুধু কাকটাই জেগে উঠতে যা সময় নিল। সে পাঁচিলে বসে দধিমুখিকে মুখ ভেংচে বলল 'ক্ক ক্কঃ'।

স্নানান্তে ভূপেন দারোগা ধরাচূড়া পরে নিজের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। সামনের চেয়ারে বসে দুটি ছেলে। দুজনেরই দোহারা চেহারা। বয়েস খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। চোখমুখ বেশ শার্প। পরনে সাফারি স্যুট, চোখে সানগ্লাস। ভূপেন দারোগা হাঁক দিয়ে বললেন, 'হুকুম সিং, তিনঠো চায় লেকে আও।'

দুজনের মধ্যে যার শরীর স্বাস্থ্য একটু ভালো সে চোখ থেকে চশমা খুলে বলল, 'হুকুম সিং বাংলা বোঝে না?'

ভূপেন দারোগা বললেন, 'হুকুম সিংকে হিন্দিতে হুকুম না করলে একটু গড়িমসি করে কী না, তাই হিন্দিতে বলা। তা আপনারা?'

প্রথম ছেলেটি বলল, 'আমার নাম প্রবাল চ্যাটার্জি, আর ওর নাম দেবকান্ত মোহান্তি।'

'তা এখানে কী মনে করে?'

'আমরা একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি মিস্টার আচার্য।'

'কীসের তদন্ত?' অবাক হলেন ভূপেন আচায্যি।

'ব্রজনারায়ণ মিত্র আর লখাই সামন্তের মার্ডারের ব্যাপারে।'

ভূপেন দারোগার ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'সে ব্যাপারে আপনাদের আমি বলতে যাবোই বা কেন?'

প্রবাল চ্যাটার্জি ধীরেসুস্থে পকেট থেকে একটা আই কার্ড বার করে ভূপেন দারোগার সামনে মেলে ধরলেন। ভূপেন দারোগা সেটা দেখেই লাফিয়ে উঠে বললেন, 'স্যার, আপনি? আগে বলবেন তো।' বলেই হাঁকডাক শুরু করে দিলেন, 'আরে হুকুম সিং, চায়ে রেহনে দো, পেহলে ঝটাকসে দোঠো ডাব কাটকে লে আও। আর হরগোবিন্দ, বাজার সে একটা দেড়কেজি পাকা রুই, বড় দেখকে খান দশেক গলদা, আর একঠো কচি দেখে পাঁঠা লে আও দেখি। পাঁঠাটা কালো হোনা চাহিয়ে আর মিষ্টি করকে ব্যা ব্যা করনা চাহিয়ে। আর রতনলালবাবু, আপনি ঝট করে থানার জিপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। মোল্লার চকের লাল দই আনবেন কিলো দুয়েক, কামিনীভোগ মিষ্টান্নালয়ের 'আবার খাবো' আনবেন একবাক্স, আর ঘুঘুডাঙার বাজারের হনুমান মিশিরের থেকে গরম বোঁদে আনুন দিকি হাফ কিলো। আরে ওই নুরু মিঞা, তুমি আলু আদা রসুন প্যাঁজ নিয়ে লেগে পড়ো। সাহেব যেন আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাদের রান্নার নিন্দেমন্দ না করেন।'

প্রবাল হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আরে করেন কী মশাই। আমরা কী বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসেছি নাকি? এসেছি একটা তদন্তের কাজে...'

ভূপেন দারোগা গড়ুরহস্ত হয়ে বললেন, 'সায়েবসুবোরা গরিবের ঘরে এসেছেন এই না কত ভাগ্যি। দাঁতে দুটি কুটো না কেটে গেলে যে থানার অকল্যাণ হবে স্যার।'

প্রবাল চ্যাটার্জি হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। দেবকান্ত বললেন, 'খাওয়ার ব্যাপারটা না হয় পরে দেখা যাবে মিস্টার আচায্যি। আগে কয়েকটা পুছতাছ সেরে নিই?'

ভূপেন দারোগা চেয়ারে টানটান হয়ে বসলেন। উর্দির পাঁচ নাম্বার বোতামটা পটাং করে ছিঁড়ে গেল। সেদিকে দৃকপাত করলেন না ভূপেন দারোগা। গলাটা গম্ভীর করে বললেন, 'বলুন স্যার।'

'ব্রজনারায়ণ মিত্র খুন হলেন কী ভাবে?'

'ওটা মোটেও খুন নয় স্যার। আপনি নিশ্চয়ই হোমওয়ার্ক করেই এসেছেন। তবুও অল্প করে বলি। ব্রজনারায়ণ মিত্তির হলেন এখানকার পুরোনো জমিদার মিত্তির বংশের ছেলে। বছর ছ'য়েক আগে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান। মাস কয়েক আগে ফিরে আসেন। এসেই কয়েকজন বেশ মার্কামারা ক্যারেক্টারের সঙ্গে ভাব

জমান। যেমন লখাই সামন্ত, এই এলাকার প্রখ্যাত গুণ্ডা। আমার মনে হয় এদের নিজেদের মধ্যেই কিছু একটা বখেরা নিয়ে গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। সেই নিয়ে খুনোখুনি আর কী।'

'হুম। এই নিয়ে এফ আই আর'টা কে লজ করেছিলেন?'

'ব্রজনারায়ণের ব্যাপারে এফ আই আর করেছিলেন তাঁর বাবা, যতীন্দ্রনারায়ণ মিত্র।'

'আর লখাইয়ের ব্যাপারে?'

একটু অস্বস্তির হাসি হাসলেন ভূপেন আচায্যি। 'দেখুন স্যার, লখাই সামন্ত ছিল যাকে বলে একজন হিস্ট্রি শীটার, দাগী লোক। তার বিরুদ্ধে আগেও অনেক অভিযোগ ছিল। লোকটা দু-একটা রাত এই থানার লক আপেও কাটিয়েছে বটে। এসব লোক যে এই ভাবেই মারা যায় সেটা তো জানা কথাই স্যার। আর ওর নিজের লোক বলতে তো কেউ নেই, একটা নাবালক ভাইপো ছাড়া। তা সে ছোঁড়া বোধহয় পুলিশি ঝামেলা বলে আর এফ আই আর-টারের হুজ্জোতে যেতে চায়নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের গগলসটা পরে নিলেন প্রবাল। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'এই পুলিশের চাকরিতে আপনার কত বছর হল ভূপেনবাবু?'

'তা দু'কুড়ি পাঁচ ধরুন। প্রায় পঁচিশ বচ্ছর।'

'তা এই পঁচিশ বচ্ছরে কখনও শোনেননি যে এরকম কেসে পুলিশ নিজেই এফ আই আর দায়ের করে তদন্ত করতে পারে?'

ভূপেন দারোগা দুঃখ দুঃখ মুখ করে বললেন, 'এই তো থানার অবস্থা স্যার। একটা সেকেন্ড অফিসার আর দুটো কনস্টেবল। তার মধ্যে হুকুম সিং রাতের বেলা চোখে দেখে না, আর হরগোবিন্দের গেঁটে বাত। কদ্দিকে সামলাবো বলুন তো?'

'তাই বলে দু'দু খানা খুনের তদন্তে আপনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভূপেন দারোগা, 'কে বলল হাত গুটিয়ে বসে আছি? ডি এস পি সাহেবকে রীতিমতো রিপোর্ট পাঠিয়েছি তো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রবাল। দেবকান্ত গম্ভীরমুখে বললেন, 'সে রিপোর্ট আমরা দেখে এসেছি মিস্টার আচার্য। আপনি রিপোর্ট দিয়েছেন দুই সমাজবিরোধী দলের মধ্যে গ্যাং ওয়ার বলে। তা ব্রজনারায়ণ মিত্রকে ঠিক কী কারণে আপনার সমাজবিরোধী বলে মনে হল ভূপেনবাবু?'

'বললাম যে, অনেক ফিকটিশাস ক্যারেক্টারের সঙ্গে মেলামেশা করতেন....'

'তাতেই কেউ সমাজবিরোধী হয়ে যায়? হতেও তো পারে তিনি তাদের সৎপথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন।'

দ্রুতবেগে মাথা নাড়েন ভূপেন দারোগা, 'কখখনো না। ব্রজ মিত্তির তেমন লোকই ছিল না।'

এবার প্রবাল চ্যাটার্জি মুখ খুললেন, 'বিষ্ণুনারায়ণ তিওয়ারিকে চেনেন ভূপেনবাবু?'

'চিনব না? বিলক্ষণ চিনি। অমন সরল, উদার, সাহসী, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, সচ্চরিত্র, দানবীর মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ হওয়াটাই তো অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।'

'খবর পেয়েছি বিষ্ণুতিওয়ারির সঙ্গে ব্রজ মিত্তিরের বেশ ভালো দহরম মহরম ছিল। তা আপনি কি বিষ্ণুতিওয়ারিকেও সমাজবিরোধী ঠাওরান নাকি ভূপেনবাবু?'

ভূপেন আচায্যি আঁতকে উঠলেন, 'কী বলছেন স্যার? অমন সজ্জন, দয়ালু, নিরহংকার, শিক্ষিত মানুষকে সমাজবিরোধী ঠাওরাবো? আমার কি বিবেকবুদ্ধি নেই? আমি কি অমানুষ পাষণ্ড?'

'আমাদের কাছে যে অন্য খবর আছে যে ভূপেনবাবু। ইনি একটি বিশিষ্ট জালিয়াত এবং জোচ্চর মানুষ। চড়া সুদে লোককে ধার দিয়ে, এবং তারপর দলিল জাল করে অন্যের জমি দখল করা এনার পেশা। তার ওপর চালে কাঁকর, সর্ষের তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ, ঘিতে ডালডা, ইত্যাদি মিশিয়ে বেচতে এঁর প্রতিভা গগনচুম্বী। আর গুণ্ডা বদমাশ পোষার ব্যাপারটা তো ছেড়েই দিলাম।'

ভূপেন দারোগার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি না করার ভঙ্গিতে দ্রুতবেগে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ছি ছি ছি, বিষ্টুবাবুর মতো একজন সদাশয়, দূরদর্শী, সমদ্রষ্টা, অকুতোভয়, নির্লোভ মানুষের ব্যাপারে এসব শোনাও পাপ।'

দেবকান্ত আর প্রবাল একে অন্যের দিকে তাকালেন একবার। তারপর দেবকান্ত গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমাদের কাছে এ খবরও আছে যে বিষ্টুবাবুর সঙ্গে আপনার মাখামাখিটা একটু বেশিই দৃষ্টিকটু। শুনলাম সদ্য নাকি আপনার মেয়ে দার্জিলিং -এ কনভেন্টে ভর্তি হয়েছে? আপনি আর আপনার গিন্নি নাকি ঘুঘুডাঙা থেকে দার্জিলিং অবধি গেছিলেন তাকে ছেড়ে আসতে? তাও আপনার নতুন কেনা মস্ত মোটরকারে? এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন ভূপেনবাবু?'

ভূপেন দারোগার মুখটা একটু শুকিয়ে এলো। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

সেই অবসরে প্রবাল চ্যাটার্জি একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'অ্যাদ্দিন যা করছিলেন করছিলেন। কিন্তু এইবারে একটু বেশি ফেঁসে গেছেন ভূপেনবাবু। এবার কিন্তু আপনার ছাড়া পাওয়া একটু মুশকিল।'

ভূপেন দারোগা গলাটা খাঁকড়ে বললেন, 'ধরা ছাড়ার প্রশ্ন উঠছে কেন স্যার?'

প্রবাল চ্যাটার্জি বললেন, 'লখনৌর এক প্রফেসর, নাম রামশরণ গুপ্তা, মাসখানেকের ওপর উধাও, বুঝলেন তো?'

'ইয়ে, কিন্তু তাতে আমি কী করব স্যার? লখনৌ তো আমার এরিয়া নয়!'

'প্রফেসর গুপ্তা যে সে লোক নন। গভর্নমেন্টের বেশ হোমড়াচোমড়াদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা আছে। বুঝতেই পারছেন, উত্তর প্রদেশের পুলিশ একেবারে আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। সেই সূত্রেই কেসটা আমাদের হাতে এসেছে, বুঝলেন।'

'ক্কে..ক্কেন স্যার? ইউ পি'র কেস বেঙ্গল পুলিশের হাতে কেন?'

'কারণ ইউ পি'র পুলিশের বয়ান অনুযায়ী উধাও হওয়ার দিন তাঁকে শেষ দেখা গেছিল মুঘলসরাই'তে, দিল্লি কলকাতা রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠতে। তারপর তাঁর মোবাইলের লোকেশন ট্রেস করে অনুমান করা হচ্ছে এই ঘুঘুডাঙার আশেপাশেই কোথাও তিনি আছেন।'

একটা ঢোঁক গিললেন ভূপেনবাবু, 'কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কেসের কী সম্পর্ক স্যার?'

'সম্পর্ক আছে আচায্যিমশাই, গভীর সম্পর্ক আছে। জানা গেছে আজ থেকে দেড় বছর আগে ব্রজ মিত্তির দেখা করেছিল রামশরণ গুপ্তার সঙ্গে। তাদের মধ্যে কী আলোচনা হয় জানা নেই, কিন্তু তারপর থেকেই প্রফেসর গুপ্তা'র মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এসব খবর ইউ পি'র পুলিশই আমাদের দিয়েছে। শুধু তাই নয় তারা খুঁজে পেতে এও বার করেছে যে ব্রজ মিত্তির তার আগের পাঁচ বছর কোথায় কোথায় চষে বেরিয়েছেন। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা বেশ পেকে উঠেছে বুঝলেন।'

ভূপেন দারোগা কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, 'তাতে আমি কী করব স্যার?'

'আপনার উচিত ছিল ব্রজ মিত্তিরের খুন নিয়ে একটু খুঁটিয়ে তদন্ত করা। তার বদলে আপনি গ্যাং ওয়ার বলে কেসটা স্রেফ ধামাচাপা দিয়ে দিলেন। কার বা কীসের চাপ ছিল ভূপেনবাবু? বিষ্টু তিওয়ারির? নাকি কেউটের ভয়ে কেঁচো খুঁড়তে চাননি? কোনটা ঠিক?'

ভূপেন আচায্যি হাতজোড় করে কিছু বলে ওঠার আগেই প্রবাল চ্যাটার্জি কঠিন গলায় বললেন, 'আপনাকে বোধহয় আর বাঁচানো গেল না ভূপেনবাবু।'

ভূপেন আচায্যি শুকনো ঠোঁট চেটে বললেন, 'এ এ এ এরকম ক্কে ক্কে ক্কেন বলছেন স্যার?'

'আপনার বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই অনেক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে ভূপেনবাবু। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে আপনার সখ্য এই এলাকার কারও অজানা নেই। লোকে আড়ালে আবডালে আপনাকে বিষ্ণুবাবুর টেনিয়া বলে ডাকে জানেন তো? টেনিয়া মানে...'

ভূপেন আচায্যি বিড়বিড় করতে লাগলেন, ' অমন উজ্জ্বলচরিত্র, বিগতস্পৃহ, দেবতুল্য...'

'সাসপেনশনের চিঠিটা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি মিস্টার আচায্যি। সেটা কি এখনই দেব নাকি লাঞ্চের পর? ডিসিশন আপনার।'

ভূপেন আচায্যি খানিকটা উদভ্রান্ত হয়ে বললেন, 'অমন নিষ্কলুষ কচি পাঁঠা, সচ্চরিত্র পাকা রুই, উদারহৃদয় গলদা চিংড়ি, দূরদ্রষ্টা লাল দই, সমদর্শী বোঁদে...'

প্রবাল চ্যাটার্জি শান্ত এবং স্থির গলায় বললেন, 'ডিসিশনটা জানাবেন প্লিজ। কলকাতার গোটা কতক সাংবাদিক আবার আমার বিশেষ বন্ধু। তারা কিন্তু একটা স্কুপ নিউজের জন্য আমাকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে বুঝলেন। এই খবরটা পেলে তারা একেবারে লুফে নেবে।'

ভূপেন দারোগা করুণ চোখে বললেন, 'কী করতে হবে স্যার?'

প্রবাল চ্যাটার্জি একটু ঝুঁকে এলেন, 'ডাবল ক্রসিং শব্দটার মানে জানেন আশা করি। অ্যাদ্দিন সরকারের খেয়ে বিষ্টুবাবুর সেবা করেছেন। এবার বিষ্টুবাবুর খেয়ে একটু সরকারের সেবা করতে হবে এই যা। রাজি?'

ভূপেন দারোগা শুকনো মুখে ছলোছলো চোখে বললেন, 'রাজি।'

* * *

পরের দিন সকালে দাঁত মুখ মেজে বাজারে যাচ্ছিল ভজন। বাড়ি থেকে বেরিয়েই গগন মল্লিক আর সতীশ ডাক্তারের মুখোমুখি পড়ে গেল সে। দুজনেই কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। ভজনকে দেখে চোখ টিপলেন গগন মল্লিক, 'কী রে ভজন, বাজারে জোর খবর তুই নাকি কোন খুড়োর জমানো টাকা চুরি করে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিস?'

ভজন হাঁউমাউ করে উঠে বলল, 'একদম না স্যার, আমি কারও কিচ্ছু চুরি করিনি, মা কালীর কিরে।'

গগন মল্লিক চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তাহলে এখন এই দামি প্যান্ট শার্ট এল কোথা থেকে শুনি? দুদিন আগে তো খেতে পাচ্ছিলিস না শুনেছিলাম।'

ভজন দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলল, 'যখন খেতে পাচ্ছিলাম না তখন তো জিগোতে আসেননি স্যার কেন খেতে পাচ্ছি না? এখন প্যান্ট শার্ট দেখে টাকার কথাটা মাথায় এল স্যার?'

গগন মল্লিক কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললে, 'এর জবাব না হয় পরে দেব একদিন। আপাতত যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।'

ভজন একটু কৌতূহলী হয়ে বলল 'কোথায় যাব স্যার?'

গগন মল্লিক কুপিত হলেন, যা তিনি স্বভাবতই হয়ে থাকেন। তিনি খপ করে ভজনের ঘেঁটি ধরে বললেন, 'যেখানে নিয়ে যাব সেখানে যাবি। এনি কোয়েশ্চেন?'

ঘুঘুডাঙায় গগন মাস্টারের প্রতিপত্তি এখনও বড়ই প্রবল। ভজন ক্যাবলার মতো ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা তাই যাব স্যার।'

তিনজনে যখন মিত্তিরবাড়িতে পৌঁছলেন তখন হেমনলিনীদেবী খুব মন দিয়ে আমের আচার বানাচ্ছিলেন। গগন মল্লিককে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'এসেছিস ভাই? আয়, দাওয়ায় বোস দিকিনি। সকালে নারকেল কুরে রেখেছি। ঘরে ডুমো ডুমো মুড়ি আছে। চিনি দিয়ে মেখে দিই?'

সতীশ ডাক্তার হাতের উলটোপিঠে একবার জিভের জলটা মুছে নিলেন। ভজন ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পিসি ভজনের দিকে কুটিল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভজন, শুনলাম তুই নাকি ম্যালা লোক লশকর নিয়ে তোর সামতাবেড়ের খুড়োমশাইকে মেরে দু টুকরো করে গঙ্গার চরে পুঁতে দিয়ে এসেছিস? তারপর নাকি ব্যাঙ্ক লুট করে সারা রাস্তাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘুঘুডাঙা পালিয়ে এসেছিস? সেই থেকে নাকি তোর ভয়ে সামতাবেড়ের রাস্তায় রাত্তিরে লোকজন চলাচল করে না। এসব কি সত্যি?'

ভজন এত স্তম্ভিত হয়ে গেল যে কোনও কথাই বলতে পারল না প্রথমে। গগন মল্লিক সস্নেহে হেসে বললেন, 'না গো দিদি, ওসব গল্প কথায় কান দিও না। ভজনের যদি অতই হিম্মত থাকত তাহলে কি আর অ্যাদ্দিন রিকশা চালিয়ে খেতে হত ওকে? ওসব বাদ দাও, দেখো আজ ডাক্তারবাবুকে ধরে নিয়ে এলাম

তোমাদের বাড়িঘর দেখাতে। নতুন লোক, বললেন আপনাদের মিত্তিরবাড়ির অনেক সুনাম শুনেছি। তাই দেখতে এলুম।'

হেমনলিনী কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে সতীশ চাকলাদারের দিয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর ফিক করে হেসে বললেন, 'এই দ্যাখ ডাক্তার, সেই দাঁত কুয়ো থেকে তুলে ফের পরেছি। কেমন ঝিলিক মারছে না?'

সতীশ ডাক্তারের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল। তিনি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'খুব মারছে পিসিমা, একেবারে হ্যালোজেন ল্যাম্পের মতো ঝিলিক মারছে।'

হেমনলিনী সুপ্রসন্ন স্বরে হাঁক দিলেন, 'ও বাবা, দেখে যাও, আমাদের ঘরবাড়ি দেখতে অতিথি এসেছে যে।'

ভিতর থেকে খালি গায়ে পাজামা পরা এক প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন। সতীশ ডাক্তার আন্দাজে বুঝলেন ইনিই যতীন্দ্রনারায়ণ। যতীন্দ্রনারায়ণ এসে সহাস্যে বললেন, 'আরে কী সৌভাগ্য, ডাক্তারবাবু এসেছেন যে। আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন।'

মিত্তিরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন সতীশ ডাক্তার। আগেকার দিনের জমিদার বাড়ি যেমন হয় তেমনই। উঁচু দেউড়ি পেরিয়ে মস্ত উঠোন। উঠোন ঘিরে টানা দালান। দালানের তিনপাশে দোতলা কোঠা। অনেকটাই ভেঙেচুরে গেছে। তবে এখনও ঠাহর করলে দেওয়ালে পঙ্খের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায়। দেউড়ির ঠিক উলটোদিকে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের দুপাশের দুটো দুটো করে চারটে ঘর এখনও বাসযোগ্য, বর্তমান বাসিন্দারা সেখানেই থাকেন। পুরো বাড়িটা জুড়ে একটা ক্ষয়ে যাওয়া সময় থমথম করছে।

'যতীনকাকা, কতবার বলেছি এ বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে ওঠো। বলি তোমাদের তো আর পয়সার অভাব নেই বাপু। তাহলে আর এই খণ্ডহরে পড়ে থাকা কেন?' বললেন গগন মল্লিক।

সামান্য হেসে যতীন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কী জানো গগন, এই দালানকোঠা ছেড়ে যেতে মন চায় না। চোখ বুজলে এখনও দেখি ওইখানে বসে মা ডালের বড়ি দিচ্ছেন। বাবা ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। এই দালানে হেম আর ব্রজ চোর পুলিশ খেলছে। সেসব টান চুকিয়ে কী চলে যাওয়া যায় হে?'

নাটমন্দিরটা খুব খুঁটিয়ে দেখলেন সতীশ ডাক্তার। শূন্য নাটদালানে এখন কয়েকটা পায়রা গলা ফুলিয়ে বকবকম করছে। ভাবতে অবাক লাগে, এককালে এই মন্দিরই দুর্গাপুজোয় সেজে উঠত ঝলমল করে। সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ত মিত্তিরবাড়ির পুজো দেখতে। আজ সেখানে থমথমে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

নাটমন্দিরের দুপাশ থেকে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সিঁড়ির দুপাশে দুটো দুটো করে চারটে থাকার ঘর। ডানদিকের দুটো ঘরের প্রথমটা হেমনলিনীর, পরেরটা ব্রজনারায়ণের। বাঁদিকের একটা ঘর যতীন্দ্রনারায়ণের, তার পাশেরটা ফাঁকা।

ব্রজনারায়ণের ঘরে ঢুকলেন চারজনে। ঢুকেই চমক। বেশ বড় ঘর। সারা দেওয়ালে বাহারি ডিজাইনের ওয়ালপেপার। দখিনমুখী জানালার সামনে জমিদারবাড়ির সঙ্গে মানানসই এক পেল্লাই সাইজের ছত্রিওয়ালা খাট। তার পাশে একটা রাইটিং ডেস্ক। মেঝেতে দামি কার্পেটের বাহার। ঘরের কোণে আধুনিক ডিজাইনের একটা ওয়ার্ডরোব। জানালার ঠিক ওপরে একটা দেড় টনের এসি। বিছানার চাদর দেখলেই তার দাম আন্দাজ করা অসুবিধা হয় না।

'ব্রজ ফিরে আসার পর ঘরটাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিল। এসি কার্পেট, ওয়ার্ডরোব এসব তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাথরুমটা আপনাদের আর দেখাচ্ছি না। এরকম দামি টাইলস, কমোড আর শাওয়ারও আমরাই প্রথমবার দেখেছি এ জীবনে, গ্রামের বাকিদের জন্য তো কথাই নেই।'

কথা বলতে বলতে তিনজনে উঠে এসেছিলেন দোতলায়। দোতলার প্রায় প্রতিটা ঘরেই তালা দেওয়া। নাটমন্দিরের ঠিক ওপরের ঘর দুটো ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে রইলেন চারজনেই। মস্ত বড় উঠোনে বাড়িটার ছায়া পড়েছে। দেউড়ির পাশের মোটা থাম জুড়ে একটা রুগ্ন বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। যেটা এককালে দারোয়ানের

ঘর ছিল সেটায় এখন ডাঁই করে ভাঙা চেয়ার, ছেঁড়া সোফা, এসব রাখা। তার পাশে একটা বিড়াল শুয়ে শুয়ে নিবিষ্টমনে থাবা চাটছে। দেউড়ির বাইরে একটা রিকশা রাখা, তার চাকাটা দেখা যাচ্ছে সামনে। এমন সময় একটা কাক কোথা থেকে একটুকরো মাছের কাঁটা তুলে এনে উঠোনে ফেলতেই চিল চিৎকার করে হাতের ন্যাতাটা গদার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে সেদিকে তেড়ে গেলেন হেমনলিনী।

বাকিরা সভয়ে ছাদে উঠে এলেন। জীর্ণ ভগ্ন ছাদ। জায়গায় জায়গায় রেলিং ভেঙে পড়েছে। বোঝা যায় যে এককালে এ রেলিং পাথরের ছিল। এখন মাঝেমাঝেই সিমেন্টের তালি তাপ্পা। ছাদ থেকে বাড়ির পেছন দিকে তাকালেই একটা বিস্তীর্ণ এলাকা চোখে পড়ে। মনে হয় আগে বাগান ছিল, এখন অনাদরে অযত্নে সেখানে ঝোপঝাড় আর বুনো গাছ ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। বাগানের শেষপ্রান্তে একটা মন্দির। মন্দিরের পাশে একটা খুব পুরোনো বটগাছ, ঝুরি নামিয়ে যেন ঘিরে রেখেছে মন্দিরটাকে।

'কীসের মন্দির ওটা?' প্রশ্ন করলেন সতীশ চাকলাদার।

'শিবমন্দির। আমরা বলি বুড়োশিবের মন্দির। বুড়োশিব আমাদের কুলদেবতা। এখন অবশ্য আর ওখানে পুজো আচ্চা হয় না। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বাণলিঙ্গ আছে। তাতেই পুজোআচ্চা সারা হয়।'

'ডাক্তারবাবুকে ওই গল্পটা বল না দাদু,' ভজনকে বেশ উৎসাহিত দেখায়।

'কী গল্প?' কৌতূহলী হন সতীশ ডাক্তার।

'বলার মতো তেমন কিছুই না।' অল্প হাসলেন যতীন্দ্রনারায়ণ, 'বাংলার প্রায় প্রতিটি জমিদার পরিবারের উৎপত্তির পেছনে যে কোনও-না-কোনও আশ্চর্য গল্প আছে জানেন নিশ্চয়ই। সেসব গল্পের সবই যে খুব গৌরবের তা নয়। আমাদেরও সেইরকমই একটা ইতিহাস আছে আর কী!'

'আচ্ছা? বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। গল্পটা শোনা যাবে?'

'তা যাবে না কেন। আপনি হাওড়ার ভূরশুট রাজবংশের ইতিহাস জানেন তো?'

'রাজা রুদ্রনারায়ণ আর রাণী ভবশঙ্করী?'

যতীন্দ্রনারায়ণ বেশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সতীশ ডাক্তারের দিকে তাকালেন, 'দাঁতের ডাক্তার যে ইতিহাসের এত খোঁজ রাখেন সে তো জানতাম না। সে যাই হোক, রাণী ভবশঙ্করী-র চতুর্ভুজ চক্রবর্তী নামের একজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ছিলেন সেটা জানেন তো? কথিত আছে যে আমাদের জমিদারির পত্তন যিনি করেন সেই রমেন্দ্রনারায়ণ মিত্তির ছিলেন এই চক্রবর্তী মশাইয়ের ডানহাত। রাণী ভবশঙ্করী সামনাসামনি যুদ্ধে পাঠানদের কচুকাটা করার পর প্রাণের ভয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ পালিয়ে চলে আসেন এদিকে। সঙ্গে টাকাপয়সা তো ছিলোই, আর মানুষটাও ছিলেন বেশ মারকুটে লোক। ফলে আসর জমাতে বিশেষ দেরি হয়নি। এখানে আসার পর রমেন্দ্রনারায়ণের এক শাগরেদ জোটে, নাম রঘুপতি সামন্ত, পাঠান সৈন্যদলের এক নামকাটা সেপাই। লোকটির পেশা ছিল চুরি ছিনতাই রাহজানি ইত্যাদি, তাই এই এলাকার রাস্তাঘাট হালহকিকত সব ছিল তার নখদর্পণে। তার সাহায্যেই খানিকটা গায়ের জোরে, খানিকটা পয়সা ছড়িয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ এই জমিদারির পত্তন করেন। এই জমিদারবাড়িও তাঁর তৈরি, ওই মন্দিরও।'

'খুব ইন্টারেস্টিং তো।'

'সে আর বলতে। আরও শুনুন, এই যে ওই বুড়োশিবের মন্দিরে আলাদা করে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন না, রমেন্দ্রনারায়ণ নিজেই পুজো করতেন। আর সেই পুজোয় সাহায্য করতেন তাঁর সেই শাগরেদ রঘুপতি সামন্ত। আরও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, আমাদের এই ভজন হচ্ছে গিয়ে সেই রঘুপতি সামন্তর বংশধর।'

ভজন একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বাগানের একদম শেষে একটা ইঁদারা দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করলেন সতীশ ডাক্তার।

'ঠিকই দেখছেন। তবে ওতে জল নেই বেশি। এককালে বাগানের ওপাশ দিয়েই ছিল গঙ্গার খাত। ইঁদারার সঙ্গে নাকি তার যোগাযোগ ছিল। এখন অবশ্য গঙ্গা সরে গেছে অনেকটা। ইঁদারাও কবেই মরে হেজে গেছে।

এককালে ওই ইঁদারার জলেই ঠাকুর পুজো হত।'

'এখন আর পুজো হয় না?'

'সে তো মন্দিরের হাল দেখেই বুঝছেন আশা করি। তবে তার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে।'

'কীরকম?'

'যে শিবলিঙ্গটিতে পুজো করা হত, তার আকৃতি ছিল বিশাল। প্রায় আট ফুট লম্বা, চার ফুট ব্যাস। দূর দূর থেকে লোকে ঘুঘুডাঙার বুড়োশিব দেখতে আসত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়।'

'দুর্ঘটনা বলতে?'

'সেবার বিজয়া দশমীর দিন বুড়োশিবের মন্দিরে চোর ঢোকে। এই এলাকার চোর না, বাইরের লোক। শিবলিঙ্গের মাথার দিকে তিনটে ত্রিপুণ্ড্রক লাগানো থাকত। প্রায় একফুট চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা। রমেন্দ্রনারায়ণই লাগিয়েছিলেন। চোর সেই তিনটে সোনার ত্রিপুণ্ড্রক খুলে নিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যায়।'

'চোর ধরা পড়েনি?'

'নাহ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক খোঁজ করেছিলেন। লোক লাগিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। শুধু বছর দুয়েক পর চন্দননগর থেকে, তখন নাম ছিল ফরাসডাঙা, খবর এল যে সেখানকার হিরু স্যাকরা নাকি কার কাছে দেখেছে তিনটে অমন সোনার পাত। শুনে আমার পূর্বপুরুষেরা সেখানে দৌড়লেন। কিন্তু তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অজাত কুজাতের চোরের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়েছে, এই অজুহাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মন্দিরটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।'

'খুব ইন্টারেস্টিং তো।'

'সে তো বটেই। শুধু সোনার ওজন বা দামের জন্য না, ওই সোনার ত্রিপুণ্ড্রকের আরও একটা গুরুত্ব ছিল। আমাদের পারিবারিক ইতিহাস অনুযায়ী রমেন্দ্রনারায়ণ নাকি এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করেন, যতদিন এই সোনার ত্রিপুণ্ড্রক বুড়োশিবের কপালে শোভা পাবে, ততদিন মিত্তির বংশের গৌরব অটুট থাকবে। বুঝতেই পারছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ওটাকে আলাদা চোখে দেখতেন। মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার সেটাও একটা কারণ।'

'আর ওই গুমঘরের গল্পটা বল দাদু, 'গগন মল্লিক উসকে দেয় ভজন।'

'আরে ধুর, ছাড়ো তো ওসব গল্পগাছা, 'যতীন্দ্রনারায়ণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

'এটা আবার কী জিনিস?' কৌতূহলী হন সতীশ ডাক্তার।

'আরে তেমন কিছু না। লোকজন বলে আমাদের এই জমিদার বাড়ির কোথাও নাকি মাটির নীচে একটা গুমঘর আছে। রমেন্দ্রনারায়ণ তাঁর অবাধ্য প্রজাদের সেই ঘরে গুম করতেন। ঘরটার আরও বিশেষত্ব হচ্ছে সেটা নাকি এমনি সাধারণ তালাচাবি দিয়ে খোলা যায় না। সে যুগে বানানো কম্বিনেশন লক দিয়ে ঘরটা বন্ধ করা।

'বলেন কি?'

'হুম। রমেন্দ্রনারায়ণের যে শাগরেদের কথা বললাম, সেই রঘুপতি সামন্ত ছিলেন এইসব কারিগরিতে একজন ধুরন্ধর মানুষ। তবে এ সবই শোনা কথা, সত্যিমিথ্যে জানা যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই চেষ্টা করেছেন সেই গুমঘর খোঁজার। কিন্তু কেউই খুঁজে পাননি।'

তিনজনে নীচে নেমে এলেন। সতীশ ডাক্তার বললেন, 'নাটমন্দিরটা একবার দেখা যায়?'

যতীন্দ্রনারায়ণ হেসে বললেন 'দেখা যাবে না কেন, আসুন না।'

শূন্য মন্দির। দেওয়াল ঘেঁষে সিমেন্টের বাঁধানো বেদি। তার সামনে মেঝেতে সুন্দর ডিজাইন করা নকশা। বোঝা যায় যে ওখানে ঘট রাখা হত। পেছনের দিকে দেওয়ালে দুটো বড় বড় জানলা। সেখান থেকে আলো

এসে মেঝের ওপর পড়ছিল। সেদিকে তাকিয়ে সতীশ ডাক্তার বললেন, 'এখন আর এখানে পুজো হয় না, না?'

যতীন্দ্রনারায়ণ হাত উলটে বললেন, 'কে করবে? দুর্গোপুজো করা কি চাট্টিখানি কথা? বাবা মারা গেছেন বিশ বছর হল। তার পরে পরেই মা-ও চলে গেলেন। ব্রজ তো সেই ছোট থেকেই বাউন্ডুলে, ঘরছাড়া। আমার গিন্নিরও বয়েস হয়েছে। এই বয়সে আর এত ধকল নিতে পারি না ডাক্তারবাবু। নইলে আমারই কি ইচ্ছে ছিল পুজো বন্ধ করার? একশো বছরের ওপর পারিবারিক পুজো, এককালে শুনেছি সাহেব সুবোরাও দেখতে আসতেন.....'

যতীন্দ্রনারায়ণ বক বক করে যাচ্ছিলেন। সেদিকে কান দিচ্ছিলেন না সতীশ। তাঁর নজরে পড়েছে যে বেদির ঠিক বাঁপাশে একটা রংচটা কাঠের দরজা, তার মাথায় শিকল লাগানো। শিকল থেকে একটা মর্চে পড়া মোটকা তালা ঝুলছে।

'ওই ঘরে কী আছে যতীনবাবু?' আঙুল তুলে দরজার দিকে নির্দেশ করলেন সতীশ ডাক্তার।

'ও, ওই ঘরটায়? তেমন কিছুই না,' হাত উলটোলেন যতীন্দ্রনারায়ণ। 'আমাদেরই কিছু পুরোনো জিনিস পত্তর, ফ্যামিলি এয়ারলুম বলতে পারেন। তবে তেমন দামি কিছু না। দেখবেন তো চলুন। আপনার তো আবার হিস্ট্রিতে ইন্টারেস্ট আছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার ভালো লাগবে আশা করি।'

দরজা খুলে আলো জ্বালালেন যতীন্দ্র। তারপর উলটোদিকের দেওয়ালে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলেন। অমনি ঝকঝকে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

চারিদিকে তাকালেন গগন মল্লিক আর সতীশ ডাক্তার। সারা ঘর জুড়ে বিচিত্র সব জিনিসপত্র সাজানো। দেওয়াল জুড়ে বড় বড় র‍্যাক। তার মধ্যে পোর্সিলিনের পুতুল, রুপোর বাসন, পেতলের বড় পিলসুজ, ধাতুর তৈরি বিভিন্ন মূর্তি এসব তো আছেই। তার সঙ্গে আছে বিভিন্ন পানপাত্র, হাতির দাঁতের ছোটখাটো কারুকার্য, ছোরা আর তলোয়ার, ছোট ছোট টেবিল ঘড়ি। দেওয়ালে ঝুলছে কিছু অ্যান্টিক ওয়ালক্লক, তিন চারটে ছবি, কিছু টিবেটান থাঙ্কা এইসব।

চারিদিকে তাকিয়ে সতীশ ডাক্তার বিস্মিত স্বরে বললেন, 'করেছেন কী মশাই? এ তো পুরো ইতিহাসের খাজানা দেখছি। এ জিনিস নীলামে ওঠালে তো লালে লাল হয়ে যাবেন আপনারা।'

যতীন্দ্রনারায়ণ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'নাহ, ডাক্তারাবুর দেখছি এই লাইনে ভালোই ইন্টারেস্ট আছে। আমি অবশ্য এসব তেমন বুঝি না। তবে এটুকু জানি আপনি যা বললেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এই ঘরে যা যা আছে সেসবের অ্যান্টিক ভ্যালু খারাপ না, অকশনে ওঠালে ভালো দামও পাব। তবে তার দরকারও নেই। বলতে নেই এখনও অবধি মিত্র বংশের খাওয়া পরার অভাব নেই কোনও।'

'লাস্ট কবে খোলা হয়েছে এই তালা?' প্রশ্ন করলেন সতীশ ডাক্তার।

'বোধ হয় ব্রজ আসার পরে পরই। আমি আর হেম তো ওকে দেখে কেঁদেই ভাসালাম অনেকক্ষণ। তারপর দুই ভাইবোনের তো গল্প শেষই হয় না। দিল্লি আর লখনউ থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছু এনেছিল ব্রজ। হেম-এর জন্য বিলিতি সাজগোজের জিনিস, আমার জন্য কোট প্যান্ট, একটা দামি মোবাইল। ঘরে একটা দামি টিভি লাগিয়ে দিয়ে বলল 'বাবা, এবার একটু ভালো করে ক্রিকেট ম্যাচগুলো দেখো।' আমি তো ভাবলাম শেষ বয়সে বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। সেই ব্রজ যে তার কয়েকদিন মধ্যেই...' গলাটা ধরে এল, কথাটা শেষ করতে পারলেন না যতীন্দ্রনারায়ণ।

গগন মল্লিক এগিয়ে এসে যতীন্দ্রনারায়ণের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'পুলিশ কী বলল কাকা?'

যতীন্দ্রনারায়ণ ধরা গলায় বললেন, 'বলল তদন্ত চলছে। এদিকে আমি বুড়ো মানুষ, আর হেমকে তো জানই। কতকাল আর এই নিয়ে লেগে থাকব বল তো?'

চারজনে নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখলেন সিঁড়ির নীচে হেমনলিনী গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যতীন্দ্রনারায়ণকে দেখে বললেন, 'বাবা, তুমি কাল পরশু'র মধ্যে একবার ব্রজ'র ঘরে ঢুকেছিলে

নাকি?'

যতীন্দ্রনারায়ণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কই, না তো? তা ছাড়া ওই ঘরের চাবি তো তোর কাছে থাকে।'

'কী জানি বাপু। দিন দুয়েক আগে মনের ভুলে চিরুনিটা ফেলে এসেছিলুম ও ঘরে, পষ্ট মনে আছে যে খাটের ওপর ছিল। এখন গিয়ে দেখি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর খাটের নীচে পেলাম। কেন বল তো?'

যতীন্দ্র কী বললেন শোনার আগেই সতীশ ডাক্তার আর গগন মল্লিক ভজনকে নিয়ে জমিদারবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন। সামনে একটা সদ্য কেনা মোটরগাড়ি ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছিল। ওঁদের দেখেই থেমে গেল। ড্রাইভারের সিটে বিশু গুছাইত, তার পাশে নরহরি চক্রবর্তী।

'কী হে বিশু নতুন গাড়ি দেখছি। কিনলে নাকি?' সহাস্যে প্রশ্ন করলেন গগন মল্লিক।

দু-কান এঁটো করা একটা হাসি উপহার দিল বিশু, 'আপনাদের আশীর্বাদ দাদা, এই মাত্তর ডেলিভারি নিয়ে এলাম। ভাবলাম গোঁসাইপুরে জগদানন্দ স্বামীজির কাছ থেকে একটা আশীর্বাদ নিয়ে আসি। তা আপনারাও যাবেন নাকি?'

আর বলতে হল না, তিনজনে ঝটপট উঠে পড়লেন গাড়িতে। গাড়িতে উঠেই খুব মিষ্টি হেসে প্রথম কথা বললেন গগন মল্লিক, 'এটা বোধ হয় মাস দুয়েকের আগের বন্যার বাজেট থেকে, তাই না বিশু? আশা করছি সামনের সাইক্লোনে একটা আস্ত প্লেনই কিনতে পারবে, কী বলো হে?'

* * *

গগন মল্লিক আর বাকিরা যখন গোঁসাইপুরে পৌঁছলেন, তখন বেশ বেলা হয়েছে। আশ্রমের সামনে মেলা লোক। ইতিউতি কয়েকটা দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে। আশ্রমের পেছন দিকে শামিয়ানা টাঙানো, সেখানে বোধ হয় খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। অপূর্ব সুবাসে চারিদিকের বাতাস আমোদিত। আশ্রমের ফুলে ফুলে সাজানো গেটের সামনে দুটো স্পীকার বসানো, সেখানে চাপাস্বরে 'মা কী আমার কালো রে' ভেসে আসছে। চৌহদ্দির একধারে একটা খুঁটিতে দুটো ছাগল বেঁধে রাখা। তারা করুণস্বরে ব্যা ব্যা করছে। চারিদিকে বেশ একটা পবিত্র ভক্তিভাব ছড়ানো।

দরজা দিয়ে ধুতি আর ফতুয়া পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, চোখেমুখে একটা ভাববিহ্বল ব্যাপার। তাঁকে দেখেই সোৎসাহে এগিয়ে গেলেন নরহরি, 'কী হে পরেশ, আজ যে একেবারে নান্দিভাস্যি কাণ্ড দেখছি। বলছি আজ কি স্বামীজির কোনও বিশেষ লীলেটিলে আছে নাকি?'

পরেশ সাঁতরা বিগলিত স্বরে বললেন, 'প্রভুজীর লীলা নিত্যই চলে চলে হে নরহরি। তাঁর প্রতিক্ষণ মাহেন্দ্রক্ষণ, প্রতি তিথি পুণ্যতিথি, তাঁর প্রতি লীলাই আশ্চর্যলীলা। জয় মহাকালী, জয় ভবানী, জয় বাবা জগদানন্দ স্বামী।'

গগন মল্লিক একটু অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'তুমি না এককালে ঘুঘুডাঙা যুক্তিবাদী সমিতির একজন হর্তাকর্তা ছিলে পরেশ? তোমার এ কী অধঃপতন।'

পরেশ সাঁতরা প্রথমে গগন মল্লিককে দেখতে পাননি। এবার লক্ষ্য করে ত্রিভঙ্গমুরারি থেকে সামান্য সোজা হলেন, গ্যালগ্যালে ভাব উধাও হল। সুমিষ্টস্বরে বললেন, 'আরে, গগনদা যে! অনেকদিন পর দেখা। ভালো আছেন তো দাদা?'

গগন মল্লিকের স্বভাবই হচ্ছে অল্পেতে উত্তেজিত হওয়া, তিনি একটু গলা তুলে বললেন, 'আমার ভালো থাকা না থাকার কথা হচ্ছে না পরেশ। কথা হচ্ছে তোমার মতিভ্রম হওয়া নিয়ে। কোন আক্কেলে তুমি এই ফেরেব্বাজ বাবাজীর পাল্লায় পড়লে?'

বিশু গুছাইত শিহরিত হল, ভজন স্তম্ভিত। নরহরি আঁতকে উঠে গগন মল্লিকের মুখটা চেপে ধরলেন, 'এসব কি এখানে না বললেই নয় গগন? বলি সুস্থ দেহে বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে নেই বুঝি?'

পরেশ সাঁতরা থমথমে মুখে বললেন, 'না জেনেশুনে কাউকে ফেরেব্বাজ বা ঠগ বলে দেগে দেওয়াটা মোটেও কাজের কথা নয় গগনদা। ওটাও একধরনের মূর্খামি। তিনি কোথাও কাউকে ঠকিয়েছেন বলে খবর

পেয়েছেন?'

গগন মল্লিক একটু ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন, 'তা নয়। তবে এসব সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী, গুরু গোঁসাই গোত্রের লোকজন প্রায়ই এসব করে বেড়ায় কি না।'

'মানেটা কী? দু-একজন চুরি করে বলে সবাই চোর? বাহবা, বাঃ! এই আপনার যুক্তিবাদের শিক্ষা নাকি গগনদা?'

গগন মল্লিক একেবারে গুটিয়ে গেলেন। এই সুযোগে পরেশ সাঁতরা বেশ ওজস্বী ভাষায় হাত পা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'শুনুন গগনদা, প্রভুজি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আমাকে জ্ঞানযোগে দীক্ষা দিয়েছেন। ভুয়ো যুক্তিবাদের অন্ধ গোঁড়ামি ছেড়ে আজ আমি সত্যিই একজন মুক্ত পুরুষ। আজ আমার হৃদয় প্রভুজীর ভক্তিস্পর্শে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তাঁর ধৈর্য বিপুল, জ্ঞান অসীম, করুণা অপার...'

গগন মল্লিক হতাশ সুরে বললেন, 'বুঝেছি। মাধ্যমিকে বাংলায় ভালো মার্কস পেয়ে পাশ করেছিলে। এখনও রচনা লেখার অভ্যেসটা যায়নি।'

এই সুযোগে সতীশ ডাক্তার এগিয়ে এলেন, 'নমস্কার পরেশবাবু। আমি সতীশ চাকলাদার, দাঁতের ডাক্তার। জয়চণ্ডীতলায় রিসেন্টলি এসেছি। বলছি জগদানন্দ প্রভু'র সঙ্গে একবার দেখা করা যায় না?'

'তা যাবে না কেন? প্রভু তো আর একচোখো রিটায়ার্ড মাস্টার নন, অকারণে কারও নিন্দেমন্দও করেন না। তাঁর কাছে সবার অবারিত দ্বার। ওই তো সোজা এগিয়ে যান, সামনের হলঘরেই কীর্তন হচ্ছে।' বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন পরেশ সাঁতরা।

আশ্রমের ভেতরে ঢুকেই একটা বড় হলঘর। দরজার বাইরে চটিজুতোর স্তূপ। চারজনে অতি সন্তর্পণে সেই স্তূপের একধারে নিজেদের চটি খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

দরজার ঠিক উলটোদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা বেদিমতন করা হয়েছে। তার ওপর দামি জাজিম পাতা। বেদির ওপর জগদানন্দ স্বামী বসে আছেন। অঘোরী সন্ন্যাসী বলতেই যেরকম মনে হয় সেরকম মোটেই দেখতে হয়। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, মাথার জটাজূট আর কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জঙ্গল পেরিয়ে বয়স আন্দাজ করা বেশ মুশকিল। পরনে রক্তাম্বর, একটা লাল উত্তরীয়কে চাদরের মতো করে গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন। দু-হাতে দশটা আংটি। বেদির নীচে দুদিকে জনা দুয়েক গেরুয়া পরিহিত চেলা। তাদের দাড়িগোঁফের ঘনঘটা বেশ নজরে পড়ার মতোই। তাদের দৃষ্টি ঘুরছে সবার ওপর, বোধহয় প্রণামীর আশায়।

স্বামীজির সামনে কম করে জনা ত্রিশেক পুরুষ বসে। দশ বারোজন মহিলাও আছেন, তাঁরা একধার ঘেঁষে বসেছেন। তবে একদম সামনে বসেছিলেন হোঁতকা মতো এক ভদ্রলোক। অসম্ভব ফর্সা, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, ঘাড়ে গর্দানে চেহারা। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় সিল্কের পাঞ্জাবি পরে একটা সাদা রঙের মোষ বসে আছে।

গগন মল্লিক বিশু গুছাইতের কান এড়িয়ে সতীশ ডাক্তারকে বললেন, 'বিষ্ণুচরণ তিওয়ারি। যার কথা কালকে বলছিলাম তোমাকে। এই এলাকার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও গুন্ডা। বিশু'র পার্টি থেকে নেক্সট ইলেকশনের টিকিট পাওয়ার চেষ্টায় আছে।'

কথাটা কিন্তু বিশুর কানে গেল। চাপাস্বরে সে বলল, 'আপনাদের পার্টিতে ঢালাও চাঁদা দেওয়ার সময় তো বিষ্টুদা'কে তো দলের সম্পদ বলতেন। এখন আমাদের পার্টির টিকিট চাইছে করে বলে গুন্ডা হয়ে গেলো?'

গগন মল্লিক বিশু'র দিকে একটা ভস্ম করে দেওয়ার দৃষ্টি দিলেন। সতীশ ডাক্তার ফিক করে হেসে ফেললেন।

জগদানন্দস্বামী বলছিলেন, 'জগন্মাতার কাছে পৌঁছনোর সবচেয়ে সহজ উপায় হল অচলা শুদ্ধাভক্তি, তাঁর পাদপদ্মে অটল আস্থা। দেহমনআত্মা সবশুদ্ধু তাতে সমর্পণ না করলে মা ভক্তকে মুক্তির পথে টেনে নেন না।'

বিষ্ণুচরণ হাত জোড় করে বললেন, 'আপনি তো জানেন বাবাজী, কাজ কাজ করে করে লাইফ একেবারে হেল হয়ে আছে। পাবলিককে সার্ভ করতেই চাই। কিন্তু বেওসা নিয়ে এত বিজি থাকি যে পাবলিককে সার্ভ

করার তেমন টাইমই পাই না। বলছি কি আমাদের মতো লোকদের জন্য, মানে পাবলিক সার্ভেন্টদের জন্য কোনও ইজি ওয়ে আউট নেই?

সতীশ ডাক্তার গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বাংলার উঠতি জনসেবক কথায় কথায় এত ইংরেজি ঝাড়েন কেন?'

'ইনি এককালে সাধারণ বাংলাই বলতেন। কিন্তু যবে থেকে নেতা হওয়ার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন, তবে থেকেই ইংরেজি বলার প্রকোপটা একটু বেড়ে গেছে দেখেছি। অশিক্ষিত পার্টির নেতা হলে যা হয়।' ফিসফিস করলেন গগন মল্লিক।

পেছন থেকে আরও মৃদুস্বরে ফিসফিস করল বিশু, 'ইনি কিন্তু এককালে আপনার পার্টির লোকাল শিক্ষা সেলের কেষ্টবিষ্টু ছিলেন গগনদা, তাও আবার মোটা চাঁদা দিয়ে, ভুলে যাবেন না মাইরি।'

পাশ থেকে নরহরি চক্কোত্তি দাঁতে দাঁত ঘষলেন, 'দুটোরই দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিতে হয়। এসেছে একটা শুভ কাজে, এখানেও শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই চলছে।'

ভজন খ্যাঁক করে হেসেই চুপ করে গেল। বিশু আর গগন মানে মানে চেপে গেলেন। ততক্ষণে বাজখাঁই গলায় বলতে শুরু করেছেন জগদানন্দস্বামী, 'অন্য পথ আছে বিষ্টু। সে পথ কর্মের পথ, সে পথেই তোমার জয়, তোমার মুক্তি। যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ছাড়াও পথ আছে, তার নাম কর্মমার্গ। তুমি নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সেবা করে যাও, বিজয় তোমার হবেই।'

বিষ্ণুচরণ সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'বিজয় তো আমার হয়েই আছে। কালকেই ডীল ফাইনাল হয়ে গেছে। কিন্তু...'

বিশু গুছাইত ফের খ্যাঁক করে হেসে চাপা গলায় বলল, 'বিজয় মাহাতো, আপনাদের কালচারাল সেলের প্রেসিডেন্ট, সে কাল আমাদের পার্টি জয়েন করছে, খবরটা জানেন তো গগনদা?'

গগন মাহাতো দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'খরচা কত পড়ল বিশু?'

'সে তেমন কিছু নয়,' ফিকফিক করে হেসে বিশু বলল, 'এবছরের নিখিল ঘুঘুডাঙা সাহিত্য সম্মানটা গচ্চা গেল, এই আর কি। আর খরচাটরচার কথা বলছেন? টাকার হিসেবে সে সামান্যই। এমনিতেও স্টেজফেজ হল ভাড়ার খরচা পার্টিই দেয়। তার সঙ্গে একটা উত্তরীয়, একটা মালা, শ'দেড়েকের একটা মেমেন্টো আর একটা মিষ্টির প্যাকেট। শ'পাঁচেকের মধ্যে আপনাদের কালচারাল সেল আমাদের পকেটে।'

গগন মল্লিক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মধুর হেসে জগদানন্দ বললেন, 'হবে বিষ্টুবাবু, হবে। একেই তোমার রাহু প্রবল, তার ওপর তিনি আগামী দেড় বছর মঙ্গলের গোচরে থাকবেন। আগামী লোকসভা ইলেকশনে তোমার টিকিট পাক্কা, কাল রাত্রে স্বয়ং জগন্মাতা আমার স্বপ্নে এসে একথা বলে গেছেন। শুধু তাই নয়, তোমার ওপর মহামায়ার কৃপা আছে। কী বলা যায়, হয়তো রাজ্যে একটা মন্ত্রীটন্ত্রী হয়ে গেলে।'

বিষ্ণুচরণ কাটা কলাগাছের মতো জগদানন্দের পায়ে পড়ে গেলেন' এখানে আপনার টেম্পল গড়িয়ে দেব গুরুদেব, সঙ্গে আপনার সোনার আইডল। জাস্ট ভোটটা দেখে নেবেন মাইরি।'

হলঘরে বিষ্ণুচরণের অনুগত চ্যালারা মৃদুস্বরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলল। বাকি ভক্তরা সিঁটিয়ে রইলেন। বিষ্ণুচরণ সজল নয়নে প্রণামট্রনাম সেরে উঠে করিমকে সামনে পেয়ে কষিয়ে একটা থাবড়া লাগালেন 'হতচ্ছাড়া, এখানে ইনকিলাব জিন্দাবাদ কী বে? এটা কি ইলেকশনের ময়দান পেয়েছিস নাকি?'

বিষ্ণুচরণ এবং তার চ্যালারা বেরিয়ে যেতেই হলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। এলাকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ গোলোকবিহারী মজুমদার বললেন, 'প্রভু, আমার নাতিটার লেখাপড়া কিচ্ছু হচ্ছে না। উদ্ধার হওয়ার কোনও উপায়?'

'হবে হবে গোলোক, সব হবে।' উদাত্তস্বরে নিদান দিলেন জগদানন্দস্বামী, 'যৌবনের ধর্মই হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা, ওতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওর কেতুটা ফেরোশাস হয়ে আছে, একটা ক্যাটস আই পরালে

ভালো হয়। তবে সামনের চৈত্রটা যাক। তারপর না হয় পরিস্থিতি বুঝে একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

আরও অনেকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন। স্বামীজি বেশ হাসিমুখে ধৈর্য ধরে সবার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। সতীশ ডাক্তার কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তিনি তীক্ষ্নচোখে স্বামীজির দিকে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর দুপুরের খাবারের সময় হয়ে এল। গগন মল্লিক অ্যান্ড কোং বিদায় নিতে যাবেন, এমন সময় সতীশ ডাক্তার হঠাৎ উঠে এসে গোঁসাইজির পা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, 'প্রভু, আমার কী উদ্ধার হবে না?'

স্বামীজিকে এতক্ষণ বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই অকস্মাৎ আক্রমণে যেন কিঞ্চিৎ ভেবলে গেলেন। খানিক গলা খাঁকড়ে বললেন, 'আপনার কী সমস্যা?'

'জীবনের মানে খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রভু। মালটা আশেপাশেই আছে, কিন্তু ক্যাপচার করতে পারছি না। তার খোঁজ কি পাব না গুরুদেব?'

স্বামীজি এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি ঝট করে আপনি থেকে তুইতে নেমে এলেন। সতীশ ডাক্তারের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'পাবি রে পাগলা পাবি, মায়ের শরণ নে, তাহলেই হবে। তিনি দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী। তাঁর শরণ নিলে ত্রিতাপ নাশ হয়, তিনি আমাদের যাবতীয় রোগ শোক ক্লেশ হরণ করে থাকেন। তাঁর পায়ের কাছে বডি ফেলে দ্যাখ পাগলা, তোর মুক্তি আটকাবে কে?'

সতীশ ডাক্তার প্রণাম করে পিছু হটে এলেন। সভা ভেঙে গেল। ভক্তরা নিজেদের নিজেদের জুতো খুঁজে যেখানে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছিল সেদিকে রওনা দিলেন।



নরহরি চক্কোত্তি গাড়িতে উঠেই গগন মল্লিককে চেপে ধরলেন, 'কী হে মল্লিকমশাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস কিছু এল?'

গগন মল্লিক গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, 'বিশ্বাস আসার মতো কিছু হয়েছে কি?'

বিশু গুছাইত খুঁ খুঁ করে হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি কথাটা স্বীকার করুন না গগনদা, বাবাজীর কাজকারবার দেখে আপনার চিত্তি চড়কগাছ হয়ে গেছে।'

শান্তস্বরে হুল ফুটোলেন গগন মল্লিক, 'তোমার মতো বেআক্কেলে লোকেদের চিত্তি শুধু চড়কগাছ কেন, অনেক জায়গাতেই চড়ে বিশু। কিন্তু তাতে যে আমার চিত্ত বিন্দুমাত্র বিক্ষিপ্ত হয় না সে তোমরা ভালোভাবেই জানো।'

বিশু গুছাইত তখনই কিছু বলল না। ভজন, সতীশ ডাক্তার আর গগন মল্লিককে সতীশের ডাক্তারখানার সামনে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার আগে মধুরস্বরে বলে গেল, 'সামনেই তো ইলেকশন, বিষ্টুদা এবার আমাদের হয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। তা ইলেকশনের ডিউটিতে থাকছেন তো গগনদা?'

গম্ভীরমুখে গগন মল্লিক বললেন, 'আমি অনৈতিক কাজকারবারীদের প্রশ্রয় দিই না বিশু। চোখের সামনে ভোট লুঠ হতে দেখতে পারব না।

বিশু গুছাইত খ্যাঁক করে হেসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

'তোমার কী মনে হল ডাক্তার?'

মৃদু হাসলেন সতীশ চাকলাদার, 'ভাবাভাবির কিছু নেই গগনদা। বাবাজী জাল।'

'মানে?' চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন গগন মল্লিক, 'জাল বাবাজী? কী করে বুঝলে?'

'একটু ভাবলে আর সামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকলে আপনিও বুঝতেন দাদা। বাবাজীর আবির্ভাবের গল্পটা মনে করে দেখুন, হরেন মুখুজ্জে যখন বাবাজীর খোঁজ পান তখন তিনি নাকি একা সাধনা করছেন। তাহলে তিনি চ্যালা জোটালেন কোথা থেকে? বাবাজী আর তাঁর চ্যালারা নতুন পাটভাঙা গেরুয়া কাপড়ই বা পেলেন কোথা থেকে? সাধুদের পরণের কাপড় তো সচরাচর এত নতুন হয় না।'

ইতস্তত করলেন গগন, 'সে তো কোনও বা কোনও ভক্ত এঁদের নতুন কাপড় দিতেই পারে। তাই না?'

'তা পারে বইকি,' মাথা নাড়লেন সতীশ ডাক্তার, 'তবে কি না বাবাজীর চ্যালাদের দাড়ি গোঁফ থেকে রীতিমতো স্পিরিট গামের গন্ধ বেরোচ্ছিলো। কাছে গিয়েই সেটা টের পেয়েছি।'

গগন মল্লিক খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সতীশ ডাক্তারের দিকে। চিন্তিতস্বরে বললেন, 'কয়েকদিন আগেই দুটো খুন হয়ে গেল গ্রামে। আজ আবার জাল বাবাজী এসে উপস্থিত। ঘুঘুডাঙায় এসব কী হচ্ছে ডাক্তার?'

সতীশ ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বললেন, 'এখনও কিছু হয়নি মল্লিকদা, আমার ধারণা ঘুঘুডাঙায় শিগ্গিরিই কিছু হতে চলেছে, সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু।'

ভজন ইতস্তত করে বলল, 'গগন স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'কী কথা ভজন?'

'একটা বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। তার সঙ্গে বোধ হয় কাকা আর ব্রজকাকার খুন হওয়ার সম্পর্ক আছে।'

সতীশ ডাক্তার আর গগন মল্লিক দুজনেই চমকে তাকালেন ভজনের দিকে। ভজন শার্টটা একটু ওপরে তুলে তার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছোট প্যাকেট বার করল। তারপর প্যাকেটা থেকে বেরোল একটা ছোট লাল রঙের ডায়েরি। সেটা গগন মল্লিকের হাতে তুলে দিয়ে ভজন বলল, 'সব কিছুর শুরু এখান থেকেই।'

* * *

সেদিন রাতে কলকাতার সি আই ডি-র দপ্তরে একটা মস্ত ডেস্কটপ স্ক্রিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটা মাথা। খুব মন দিয়ে একটা সিসিটিভি-র ফুটেজ দেখছিল কেউ। একটা জায়গা বার কয়েক দেখার পর একজায়গায় স্থির হল ভিডিওটা। স্ক্রিন জুড়ে একজনের মুখ। এবার আরেকটা উইনডো খোলা হল। তাতে একজন মানুষের পাসপোর্ট সাইজের ছবি। এবার কিছু একটা সফটওয়্যার রান করানো হল দুটো ছবি দিয়ে। কিছুক্ষণ পর স্ক্রীনে ফুটে উঠল একটা লেখা, 'এইট্টি টু পার্সেন্ট ম্যাচ ফাউন্ড।'

পাশেই রাখা ছিল একটা ল্যান্ডলাইন। সেখান থেকে একটা মোবাইলে কল করা হল। ওদিক থেকে হ্যালো ভেসে আসতেই এপারের মানুষটি বলল, 'চিড়িয়া স্পটেড স্যার।'

গ্যাঁড়াপোতা স্টেশনে এসেই একটা ফাঁকা ট্রেন পেয়ে গেল ভজন। কামরায় উঠে একদম শেষের দিকে জানলার পাশে একখানা ফাঁকা সিট দেখে বেশ জুত করে বসল সে। বেশ রাত হয়েছে, ফাঁকা কামরা ওপারে চারটে লোক বসে তাস খেলছে। এপারের সিটে তেমন কেউ নেই। ভজন বসেছে কামরার বাঁদিকের জানলা ঘেঁষে। ওর সঙ্গে আরও একটা লোক উঠল। সে বসেছে ডানদিকের জানলার কাছে।

ভজন সিটে বসে কাঁধের ঝোলাটাকে সাবধানে কোলের ওপর রাখল। ওর মধ্যে আছে স্টেশন বাজারের দাশরথি বুক স্টল থেকে কেনা ওর কয়েকটা পছন্দের বই। আর সেই কালান্তক ডায়েরিটা।

গত দুদিন ধরে এই ডায়েরিটা নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তেও কিছু কূলকিনারা করতে না ভজন শেষমেশ কাল রাতে গগন মল্লিকের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলে। হাজার হোক গগন মল্লিক বুঝদার মানুষ, অনেক জানাশোনা আছে।

গগন মল্লিকের পরামর্শেই ভজন গ্যাঁড়াপোতায় এসেছিল ভূপেন দারোগার কাছে। ঘুঘুডাঙা, নবাবগঞ্জ, ময়নাতলা আর গ্যাঁড়াপোতা, এই চারটে গ্রাম মিলিয়ে থানাটা গ্যাঁড়াপোতাতেই। কাকা খুন হয়ে যাওয়ার পর পরই ভূপেন দারোগার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল বটে। কিন্তু ভূপেন দারোগা ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেয়নি, 'তোর কাকা খুন হয়ে তোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল রে ভজন, এবার একটু স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে কাজেকম্মে মন দে দিকি,' বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। আজও মোটেই কিছু সুরাহা হল না। ভূপেন দারোগা ডায়েরিটা দেখেই তেড়িয়া হয়ে, 'আমার সঙ্গে মশকরা হচ্ছে মর্কট? এসব অং বং চং নিয়ে সরকারি কাজের সময় নষ্ট করা কীরকম বিপজ্জনক কাজ জানিস? পেনাল কোডের সাড়ে চুয়াত্তর নং ধারার একুশের বি উপধারায় লকআপে ঢুকিয়ে দেবো নাকি দুটো রামগাঁট্টা?' এসব বলে টলে ওকে ভাগিয়ে দিলেন। গগন মল্লিকের কথা শুনে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'যা যা, হাঁদাগোবিন্দ পাগলা মাস্টারটাকে বল আগে পরের ইলেকশনটা জিতে আসতে, তারপর যেন আমাকে লোক পাঠিয়ে চমকাতে আসে।'

ট্রেনের দুলুনিতে চোখ বুজে এসেছিল ভজনের। এই এলাকার লোকজন স্টেশনের দূরত্ব মাপে ঘুম দিয়ে। যেমন নবাবগঞ্জ থেকে ময়নাতলা এক ঘুম, চাপড়ামারি থেকে পোড়াপীরতলা দেড় ঘুম, এইরকম। মাঝেমধ্যে সেসব নিয়ে মহা ঝামেলা ঝঞ্ঝাটও হয়। এই তো সেদিনই কী কেলেঙ্কারি। এই এলাকার মহাপ্রসিদ্ধ হেকিম মইনুল খাঁ সায়েবের বয়েস হয়েছে নব্বইয়ের কাছাকাছি, তিনি প্রায়ই রোগী দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। সেদিন তিনি শেতলাতলা থেকে ট্রেনে উঠেছেন মসজিদ পাড়া যাবেন বলে, আড়াই ঘুমের রাস্তা। কিন্তু তার বদলে পৌঁছে গেছেন নিত্যানন্দনগর, তিন ঘুম পরের স্টেশন। ঘুম থেকে উঠে তো তাঁর চক্ষুস্থির! তারপর তো স্টেশন মাস্টার বলাই নন্দীর সঙ্গে মইনুলচাচা-র সে কী উস্তমকুস্তম লড়াই। বলাই নন্দী যতই টাইম টেবিল ঠেকায়, মইনুলচাচা ততই লাফিয়ে উঠে বলেন যে আশরাফুল মখলুকাতের পক্ষে হাফ ঘুম এমন কিছু গুণাহ নয়। ট্রেন কোম্পানীর উচিত ছিল গাড়ি ধীমেতালে চালানো। শেষমেশ মইনুলচাচার নাতনি এসে তার ঠাকুর্দাকে বকেঝকে বাড়ি নিয়ে যেতে ব্যাপারটা সেবারের মতো ঠান্ডা হয়।

ভজনের হিসেব আছে ঘুঘুডাঙা পৌঁছতে কতখানি ঘুমোতে হবে। কিন্তু চোখ বোজার কিছুক্ষণ পরেই ভজনের একটা অস্বস্তি হতে লাগল। চোখ খুলল সে, তারপর একবার হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতেই চোখাচোখি হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে।

ডানদিকের জানালায় বসা লোকটা সরে এসে এখন ঠিক ওর পাশে। শুধু যে পাশে বসে আছে তাই নয় ওর দিকে জুলজুল করে চেয়েও আছে বটে। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের থেকে শুরু সত্তর আশি নব্বই যা খুশি হতে পারে। দড়কচা মারা চেহারা, মাথায় খোঁচাখোচা চুল, ভাঙা গালে এবড়োখেবড়ো দাড়ি। পরনে একটা নোংরা ফতুয়া আর ধুতি, চোখে একটা ভাঙা ডাঁটির চশমা। ভজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেলল লোকটা, তারপর গ্যালগ্যালে হেসে প্রশ্ন করল, 'কী দাদুভাই, আজ কী বই কিনলে?'

লোকটার গলাটা যেন কেমন, ঘ্যাসঘ্যাসে, চেরা চেরা। তবে দাদুভাই ডাকটা শুনে ভজনের আচমকা রাগ হয়ে যাওয়াতে সেটাকে ঠিক আমল দিল না সে। গলাটা স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি গম্ভীর করে পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'আপনাকে তো চিনলাম না।'

'হে হে হে, সে আর কী করে চিনবি রে দাদুভাই। শেষ যখন তোকে দেখি, তখন তুই কত্তটুকুন,' তুমি থেকে এবার সোজা তুইতে নেমে এল লোকটা। উঠলোও বটে, উঠে এসে চেপেচুপে ভজনের পাশটিতে গ্যাঁট হয়ে বসল। তারপর মধুমাখা হাসি ছড়িয়ে বলল, 'বলি আজ কীসের বই কিনলি দাদুভাই, গোয়েন্দাগল্প না ভূতের বই?'

ভজন ভুরু কুঁচকে বলল 'আমি যে গোয়েন্দা বা ভূতের গল্পেরবই কিনেছি সে কথা আপনি জানলেন কী করে?'

লোকটা একটু খানিক দুলে দুলে হেসে বলল, 'সব জানি রে দাদুভাই। শেষ বই কিনেছিলিস তোর কাকা বেঁচে থাকতে, নিঝুম পালের গোয়েন্দা উপন্যাস 'হারানো লুঙ্গির খোঁজে।' তার আগে কিনেছিলিস ভোম্বল সরখেলের ভয়াল ভয়ংকর ভৌতিক গল্পের সংকলন, 'কঙ্কালের গায়ে কাঁটা।' তার আগের হপ্তায় কিনেছিলিস জগাই তোপদারের সাড়া জাগানো অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'উড়ন্ত সাবমেরিন'। তারও আগের সপ্তাহে.. কী দাদুভাই আর বলতে হবে?'

ভজন এত অবাক হয়ে গেল যে খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

লোকটা একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, 'ওরে পাগল, ইথার তরঙ্গের নাম শুনেছিস? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে ইনফর্মেশনগুলো ইথার তরঙ্গে মৌরলা মাছের মতো কিলবিল করছে যে রে। মাঝেমধ্যে সাঁতরাতে সাঁতরাতে এদিকপানে চলে এলেই হল। খাপলা জাল ফেলে তুলে ফেলতে কতক্ষণ?'

ভজন অবিশ্বাসের সুরে বলল 'আপনি খাপলা জাল ফেলে ইনফরমেশন না কীসব বললেন, সেসব ধরেন?'

লোকটা সামান্য ভাবুক হয়ে বলল, 'সে তো অনেক লম্বা কাহিনী রে দাদুভাই। ও খাপলা জাল সামান্য নয়, ওকে বলে জ্ঞানজালিকা। প্রথমে নিরালম্ব বায়ুভূত দিয়ে কামনা বাসনার সুতোগুলোকে বেশ টাইট দিয়ে বাঁধতে হয়। তারপর তাতে দেহবন্ধনের জালকাঠি ফেলে, প্রজ্ঞা আর উপায়ের আড়বাঁশে টাঙিয়ে ব্রহ্মকৃপার রোদে শুকুর দেওয়াটাই দস্তুর। তারপর তাতে এট্টুসখানি কড়া করে হঠযোগের মোম মাখিয়ে নিলেই, ব্যস জ্ঞানজালিকা তৈরি।'

মুখের হাঁ টা সন্তর্পণে বুজিয়ে নিল ভজন। তারপর বেজার মুখে বলল, 'আজ ভূতের বই কিনেছি। গণেশ হালুইয়ের, 'পেত্নীর জিঘাংসা।'

লোকটা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'বেশ ভালো বই। আমি তো প্রায়ই পড়ি। বিশেষ করে ওই শেষে যখন দেখা গেল চাটুজ্জেদের মেজবউ বামাসুন্দরীই আসলে পেত্নী, আর তাকে ওই মদন ওঝা হাঁকিনীবাণ দিয়ে বিস্তর নাজেহাল করল, সেটাই হল' গে গল্পের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, বুঝলি কি না।'

ভজন ভারি ব্যাজার হল। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক। গল্পের শেষটাই কেউ যদি আগেভাগে বলে দেয়, কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে? ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়ল সে। এভাবে সব গল্পই যদি আগেভাগে বলে দেয়, তাহলে তো মুশকিল!

ঘুঘুডাঙায় নেমে ভজন দেখল যে লোকটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে। এমনকি তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই গ্যালগ্যালে হাসি হেসে তার দিকে তাকিয়ে অবধি আছে। হাসিটা দেখে ভজনের পিত্তি জ্বলে গেলেও কিছু বলল না ও। লোকটা তো ওকে বিরক্ত করছে না।

স্টেশন থেকে নেমে রিকশাস্ট্যান্ড। সেখানে রামপিয়ারি তার নতুন কেনা টোটোর সিটে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। ভজনকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে টোটো থেকে নেমে সসম্ভ্রমে বলল, 'আইয়ে ভজনজি, আইয়ে। কুথায় ছেড়ে দিতে হোবে বোলেন।'

ভজন ভারি বিব্রত হল। বেশিদিন না, দিনকতক আগেই এই লোকটার কাছে কাজ করত সে। টোটো চড়ার আশা ছেড়ে দিয়ে স্টেশন চত্বরের অন্য রাস্তাটা ধরা মনস্থ করল ভজন। ওটা ডাইনিজলার রাস্তা, অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল। একটু শুনশান হলে কী হবে, বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় বটে।

দু'পা ফেলেই ভজন টের পেল লোকটা ফের পাশে ঘনিয়ে এসেছে। একটু উদাস স্বরে বলল, 'তোর বাপ বেঁচে থাকতে লস্কর বাড়িতে কী আদর যত্নটাই না পেতাম রে দাদুভাই। এই তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি মাখা আসছে তো তারপরেই মাখা সন্দেশ। আর সে তেলেভাজার সাইজ কী! ঘুঁটের সাইজের আলুর চপ, হাওয়াই চপ্পল সাইজের বেগুনি। তারপর ধর শীতের সময় ফুলকপির শিঙাড়া আর গাজরের হালুয়া তো বাঁধা।'

ভজন শক্ত মুখে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই। আপনাকে কিছু খাওয়াতে টাওয়াতে পারব না।'

লোকটা ছলো ছলো চোখে বলল, 'টাকার কথা তুললি দাদুভাই? পারলি? ওরে তুই কী আমার পর রে? আহা সেই চোখ, সেই নাক, এমনকি মাথার সামনের দিকের টাকটা অবধি তোর বাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। তোর কাছে কী আর টাকা চাইতে পারি রে পাগলা। আজ আমিই তোকে না হয় কিছু একটা খাওয়াব, চল।'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল ভজন। সেই কোন দুপুরে দুটো রুটি আর ঢ্যাঁড়সের তরকারি খেয়েছিল সে। সে কখন পেটের মধ্যে তলিয়ে গেছে। ট্রেনে ওঠবার আগে একটা পেয়ারা কিনে খেয়েছিল বটে। তবে তাতে পেটের খিদেটা তো কমেইনি, বরং দাউদাউ করে জ্বলে এখন প্রায় দাবানল। লোকটাকে সে চেনে না বটে, তবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাটাও বোধ হয় ঠিক হবে না।

তা খেল বটে ভজন। বইয়ের ব্যাগটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রে রে করে নেমে পড়ল মাঠে। দুটো ডাবল এগরোল উড়িয়ে কুড়ি টাকার ঘুগনি খেল। ফুচকা খেল গোটা দশেক। তারপর চারটে আলুর চপ খেয়ে যখন দুটো ডিমের ডেভিলের অর্ডার দিচ্ছে, তখন লোকটা আর থাকতে পারল না। খপাত করে ভজনের হাতটা চেপে ধরে করুণ সুরে বলল, 'একদিনে কি এতটা খাওয়া ঠিক হচ্ছে দাদুভাই? বলি পেটের ইলাস্টিসিটি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। তারপর নাইট যাকে বলে স্টিল ইয়াং, বাড়ি গিয়ে রাতের খাওয়ার কথাটাও তো ভাবতে হবে।'

ডিমের ডেভিলটা ধীরেসুস্থে চিবোতে চিবোতে নিমীলিত নয়নে ভজন বললো, 'ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না দাদু। এখন তো তাও কম খাচ্ছি আজকাল, ডায়েটে আছি কি না। মাস ছয়েক আগে এলে দেখতেন।'

লোকটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'না না থাক। আরেকটু দেখালেই আমার হার্টফেল করা ছাড়া উপায় থাকবে না রে দাদুভাই। আজ চলি রে, অনেক রাত হল। ওদিকে আবার তোর দিদা'র গাদাগুচ্ছের কাজ পড়ে আছে।' বলে বইয়ের ব্যাগটা গদাইকে ফিরিয়ে দিয়ে লোকটা তড়বড় করে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল ফের। তখনই ডাউন মুকুন্দপুর লোকাল দাঁড়িয়েছিল স্টেশনে। লোকটা লাফিয়ে একটা কামরায় উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

লোকটার ত্রস্ত পালিয়ে যাওয়া দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ খ্যা খ্যা করে একটা ভারি জিঘাংসু হাসি হাসল ভজন। তারপর বইয়ের ব্যাগটা তুলে দুলকি চালে রওনা দিল ডাইনিজলার দিকে।

তবে তাকে বেশিদূর যেতে হল না। সবে ডাইনিজলার জঙ্গল পেরিয়ে গঙ্গার ঘাটের রাস্তাটা ধরেছে সে, এমন সময় অন্ধকারের আড়াল থেকে কারা যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভজন একটুখানি লড়ার চেষ্টা

করেছিল বটে, তবে তার নাকে কে যেন একটা ভেজা রুমাল চেপে ধরতেই একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ নাকে এল ভজনের। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সে।

* * *

গভীর রাত। অন্ধকার ঘরে দুজন মানুষ বসে আছেন। একজনের সামনে একটা ল্যাপটপ খোলা। সেখান থেকে মৃদু আলো তাঁর মুখে এসে পড়ছে। অন্যজন বসে আছেন ঘরের অন্যপ্রান্তে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে তাঁর ঠোঁটে ধরানো আছে সিগারেট। তার ডগায় নেচে বেড়ানো আগুনের ফুলকিতে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি জেগেই আছেন এবং ঈষৎ নড়াচড়াও করছেন।

'কী পার্টনার, কীভাবে এগোবে এবার?'

'বুঝতে পারছি না। একটা ক্লু না পেলে কোডটা ক্র্যাক করা খুব মুশকিল।'

'তাই বললে হবে পার্টনার? তাহলে আর এত কাঠখড় বার্ন করে মাস্টারকে ডেকে আনাই বা কেন আর এত ট্রাবল ঘাড়ে নেওয়াই বা কেন?'

'আমার তো মাথায় ঢুকছে না।'

'ঢোকাও পার্টনার, ঢোকাও। মিত্তিরবাড়ির ওই সিক্রেট ট্রেজারের ভাগ দেব, এই বলে ভূপেন দারোগার মুখ ক্লোজ রেখেছি। কোড যদি ক্র্যাক না করতে পার, তাহলে আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরাতে দারোগার এক সেকেন্ড লাগবে না। আমি জেলে গেলে যে অ্যালোন যাব না, সেটা আশা করি বোঝো।'

'এটা কি ধমকি?'

'ধমকি বললে ধমকি, রিকোয়েস্ট বললে রিকোয়েস্ট।'

'ডায়েরিটা যদি কয়েকদিন আগে হাতে পেতাম তাহলে সুবিধা হত। আরও কিছুটা টাইম পাওয়া যেত।'

'আরে তার চেষ্টা কি করিনি হে? জানো তো, গোটা বাড়িটাই তো ক্যাপচার করার প্ল্যানে ছিলুম। শিওর ছিলুম যে বেজা মিত্তিরের কথা মতো লখাই এমন জায়গায় ডায়েরিটা হাইড করেছে, যেটার খোঁজ ইজিলি পাওয়া যাবে না। অন্তত ভজনের মতো ফ্যাট হেড ছেলের পক্ষে তো খুঁজে পাওয়া একেবারেই ইমপসিবল। বাড়িটা হাতে এলে খোঁজাটা ইজি হত। কিন্তু ছোকরা যে ওর কাকার ধারটা মিটিয়ে দেবে আর ডায়েরিটাও ফাইন্ড করে নেবে, কেই বা জানত?'

'তার মানে আজ যদি মাস্টার নিজে গিয়ে ডায়েরিটা না উদ্ধার করে নিয়ে আসত, তাহলে এখনও আমাদের অন্ধকারে হাতড়াতে হত, তাই তো?'

'হে হে হে। আরে আমার বিলিভ ছিল যে তুমি মাথা খাটিয়ে কিছু না কিছু একটা রোড বার করবেই। আরে মাস্টার আর এ লাইনের যাকে বলে বলে কিং।'

'হুম, তা এবার কেসটা প্রথম থেকে খুলে বলতে হচ্ছে যে। মানে কাদের গুপ্তধন, কীসের গুপ্তধন, এসব জানা আছে বটে। কিন্তু ধোঁয়াশা যে তাতে পুরো মিটছে না।'

'সে অনেক ওল্ড স্টোরি পার্টনার। সবাইকে বলাটা ঠিক না। কিন্তু আজ মাইন্ড হ্যাপি হয়ে আছে বলে তোমাকে বলছি।'

'একটা রিকোয়েস্ট, কথার মধ্যে ইংরেজির ফোড়নটা না দিলেই নয়?'

বিষ্টুচরণ ব্যাজার হলেন। হাতের সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন,

'আজ থেকে বছর সাত আটেক আগেকার কথা। ফাদার গ্র্যান্ড ফাদারের, মানে বাপ পিতেমোর পুরোনো দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটছিলাম, পোড়াপীরতলার একটা জমি গাপ করব বলে, বুঝলে। এমন সময় একটা খুব পুরোনো ঝুরঝুরে একটা খেরোর খাতা আমার হাতে আসে। সে এমন জায়গায় ছিল যে আমি তো প্রথমে খুঁজে পেয়ে অবাক। প্রথমে ভেবেছিলাম এমনি ফালতু কিছু হবে। কিন্তু দুটো পাতা ওলটাবার পরেই বুঝলাম যে এর পেছনে অনেক গভীর রহস্য আছে।।

মিত্তিরবাড়ির বুড়োশিবের মাথায় যে এককালে সোনার ত্রিপুণ্ড্রক আঁটা থাকত, আর সেটা যে আজ থেকে একশো বিশ তিরিশ বছর আগে চুরি যায় সেটা এই এলাকার সবাই জানে। যেটা জানতাম না, সেটা হচ্ছে যে এর পেছনে আমারই এক পূর্বপুরুষ রামনারায়ণ তিওয়ারির হাত আছে।

রামনারায়ণ তিওয়ারি লিখে যান যে সেকালে রতিকান্ত মল্লিক নামে একজন বেশ উঁচু লেভেলের চোর ছিল। পুরো এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিসপত্র চুরি করে বড়লোকদের কাছে বেচাই ছিল তার পেশা। লোকটি কোন দেশীয় তা জানা যায় না, শুধু এটুকু জানা যায় যে সেই সময় রতিকান্ত মল্লিক ছিল এই লাইনের মুকুটহীন সম্রাট।

এহেন রতিকান্ত মল্লিকের নজর পড়ে ঘুঘুডাঙার রাজবাড়ির বুড়োশিবের মাথায় সাঁটা সোনার ত্রিপুণ্ড্রকের ওপর। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে এই তিনটে সোনার পাত চুরি করা মনস্থ করে। সঙ্গী হিসেবে পায় গ্রামেরই এক বাসিন্দা গঙ্গাপদ সামন্তকে। মজার ব্যাপার কী জানো পার্টনার? এই গঙ্গাপদ হচ্ছে মিত্তিরদের জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা রমেন্দ্রনারায়ণ মিত্তিরের ডানহাত রঘুপতি সামন্তর বংশধর।

'মানে? এই লখাই সামন্ত রঘুপতি আর গঙ্গাপদর কেউ নাকি?'

'একশোবার কেউ, আলবাৎ কেউ। লখাই ওই সামন্ত বংশেরই ছেলে বটে। সে যাই হোক। গঙ্গাপদর জিগরি দোস্ত ছিলেন আমার এক পূর্বপুরুষ রামনারায়ণ তিওয়ারি। তিনি গঙ্গাপদর কাছ থেকে এই অভিযানের পরিকল্পনা শুনে খানিকটা জোর করেই এতে শামিল হন। তাঁকে বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রতিকান্ত মল্লিক আর না করেননি।

কিন্তু চুরি করার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। তিন নম্বর পাতটা খোলার সময় জমিদার বাড়ির লোক টের পেয়ে যায় যে বুড়োশিবের মন্দিরে কেউ ঢুকেছে। গ্রামের সবাই তেড়ে আসতে রতিকান্ত, গঙ্গাপদ, আর রামনারায়ণ তিনজনেই পালাতে বাধ্য হন। তাড়াহুড়োয় রতিকান্ত ত্রিপুণ্ড্রকের তিনটে পাতের প্রথম দুটো নিয়ে পালাতে পারেন। তৃতীয় পাতটা রয়ে যায় রামনারায়ণের হাতে।

রামনারায়ণ তৃতীয় পাতটা খুঁটিয়ে দেখে বোঝেন যে এটা একটা গুপ্তধনের নকশা। এই এলাকায় কথা প্রচলিত ছিল যে, মিত্তিরদের জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা রমেন্দ্রনারায়ণ যখন রাণী ভবশঙ্করীর সৈন্যদল ছেড়ে পালিয়ে আসেন, তখন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বিপুল ধনসম্পদ। তার কিছুটা দিয়ে এই জমিদারির পত্তন হয়। বাকিটা তিনি কোনও কৌশলে ওই জমিদারবাড়ি মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রাখেন।

রামনারায়ণ অনুমান করেন যে ওই তিনটে ত্রিপুন্ড্রকের মধ্যেই তার খোঁজ লুকোনো আছে। কিন্তু ততক্ষণে বাকি দুটো পাত উধাও। তিনি তৃতীয় পাতের লেখাটা একটা খেরো খাতায় লিখে রাখেন। পাতটা লুকিয়ে রাখেন বাড়ির একটা দেওয়াল গেঁথে, নইলে তাঁর ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি এও লিখে যান যে এরপর তিনি গোপনে রতিকান্ত মল্লিকের অনেক খোঁজ করেন। কিন্তু লোকটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছিল।

রামনারায়ণের এই খেরোর খাতাটা আমার হাতে এসে পড়াতে আমি বুঝে যাই যে কী বিপুল সম্পদের খোঁজ আমার হাতে এসে পড়েছে। রাজনীতিতে আসার জন্য তখন থেকেই প্রিপারেশন নিচ্ছি, আর তার জন্য টাকার দরকার তো বটেই। তা ছাড়াও মিত্তিরবাড়ির গোপন সম্পদ উদ্ধার করে দেশের সরকারের হাতে তুলে দিতে পারলে সেটাও যে ভোটের ময়দানে আমার পক্ষে একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি সব ভেবেচিন্তে সব কথা ব্রজ, মানে বেজাকে খুলে বললাম। ভাবলাম হাজার হোক ছোটবেলা থেকে জিগরি দোস্ত, তা ছাড়া সম্পত্তিটা তো আসলে ওদেরই।

বেজা ছোটবেলা যেমন ডাকাবুকো ছিল তেমনই গোঁয়ারগোবিন্দ। সে তো একেবারে উঠেপড়ে লাগল রমেন মিত্তিরের গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে। কিন্তু তার জন্য সবার আগে রতিকান্ত মল্লিকের খোঁজপত্তর

পাওয়াটা খুব জরুরি। বেজা নিয়মিত কলকাতা যেতে লাগল ব্রিটিশ আমলের পুরোনো লাইব্রেরি আর মহাফেজখানায় রাখা পুরোনো দলিল দস্তাবেজ খুঁজে দেখতে।

শেষমেশ বছর খানেকের মাথায় কলকাতা পুলিশের কোনও একটা মহাফেজখানা থেকে ব্রজ রতিকান্ত মল্লিকের উল্লেখ পায়। কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট যাঁর হাতে তৈরি, সেই স্যার স্টুয়ার্ট হগের নিজের হাতে লেখা একটা রিপোর্টে নাকি 'দ্য গ্রেট রবার র‍্যাটিকাণ্টা মাল্লিক' উল্লেখ আছে। তার বাড়ি নাকি লখনউ।

রিপোর্টে রতিকান্ত'র ব্যাপারে যা জানা গেছিল সেসব টুকলি করে, ব্রজ মিত্তির একদিন ধাঁ। সোজা লখনউ গিয়ে ওঠে। ব্যাপারটা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। আমি আর বেজা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলাম যে দুজনেই এই নিয়ে চুপ থাকব যতদিন না মিত্তিরবাড়ির গুপ্তধন পুরো উদ্ধার হয়।

বেজা কী করে ওখানে রতিকান্ত মল্লিকের বংশধরদের খোঁজ পায় বলা মুশকিল। তবে ওই যে বললাম, বেজা মিত্তিরের গোঁ ছিল সাঙ্ঘাতিক। সে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাক করে যে রামশরণ গুপ্তা নামের এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের কাছে রতিকান্ত শুক্লার চুরি করা সোনার ত্রিপুণ্ড্রকের দুটো পাত এখনও আছে।

প্রফেসরও গুপ্তার সঙ্গে বেজার কী কথা হয়েছিল বলা মুশকিল। শুধু আজ থেকে ছ'মাস আগে বেজা গ্রামে এসে উপস্থিত। আমাকে চুপিচুপি বলল, সোনার পাত দুটো সে পেয়েছে বটে। কিন্তু সেগুল সে আমাকে দেখাবে না। তার বদলে সেই পাতে লেখা নকশা আর লেখাগুলো সে একটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছে।'

'ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

'তারপরই শুরু হল খেল। বেজা হঠাৎ বেঁকে বসে বলল, আগে আমার পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা সোনার পাতটা ওকে দেখাতে দিতে হবে, তবেই ও ডায়েরিটা আমাকে দেবে। এই নিয়ে কিছুদিন টানাপোড়েন চলল। ইতিমধ্যে বেজা লখাইকে হাত করে ফেলেছে। তুমি তো জান, এই পরগণায় লাঠিয়াল হিসেবে লখাই সামন্তের নাম আছে। তার ওপর তার মেজাজখানাও বেশ শানানো। তাকে আমার করিম, হরেকৃষ্ণ সবাই ডরায়। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন মন কষাকষি হওয়ার পর একদিন একটা প্ল্যান ভাঁজলুম। বেজাকে ডাকলাম ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করার জন্য। বেজা সরল বিশ্বাসে এল। এদিকে আমিও তৈরি ছিলুম। করিম আর হরে ছাড়াও বাইরে থেকে আরও দুজন গুণ্ডা এনেছিলাম। ব্রজর সঙ্গে কথা কাটাকাটির মধ্যে তাকে কায়দা করে বেঁধেও ফেললাম। তারপর দুটো কড়কানি দিতেই জানা গেল বেজা ডায়েরিটা দিয়েছে লখাইকে, লুকিয়ে রাখার জন্য। এখন লখাই কোথায় সেটা সরিয়ে রেখেছে সেটা জানার আগেই দেখি কোত্থেকে সেই মূর্তিমান হা রে রে করে লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে। বেজা যে লখাইকে সঙ্গে করে এনে দূরে লুকিয়ে রাখবে সেটা ভাবিইনি। ছোকরা যে একটু মাথামোটা জানই তো, যাকে বলে চোতক্ষ্যাপা টাইপের। সে এসে যা হুড়ুমদুড়ুম শুরু করে দিলো আর কহতব্য নয়। মিনিট খানেকের মধ্যে দেখি করিম আর হরে দুটোই মাটিতে পড়ে উরে বাবা রে মা রে করছে। লখাই হতচ্ছাড়াদুটোর ওপর আরও কিছু হাত মকশো করে নিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগেই ওই ভাড়া করা দুই স্যাঙাত 'ধ্যাত্তেরি ছাই', বলে দুটো পেটো ঝেড়ে দিল বেজা আর লখাইয়ের ওপর।'

'বাহ বাহ, শাব্বাস। বেশ সরেস লোকজনকেই কাজে আনা হয়েছিল তাহলে।'

'বেজাকে খুন করা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল না পার্টনার, উদ্দেশ্য ছিল ওর ডায়েরিটা হাত করা। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখলাম বেজা ওই মারাত্মকভাবে আহত অবস্থাতেও বাঁধন খুলে ফেলে ওই অকম্মাদুটোর দিকে নিজের রিভলবার দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে দুটো গুলি দেগে দিল, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমিও আমার পিস্তলটা বার করে...'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এতক্ষণে সবটা ক্লিয়ার হল।'

'তারপর বাকিটা তো জানই, হেঁ হেঁ। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার আর মাস্টারের হেল্প না পেলে তো আমি তো ওই গুপ্তধন উদ্ধারের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম প্রায়। সে যাই হোক, এই এতক্ষণে তোমার কাছে সবটা খোলসা করে বলে বেশ হ্যাপি হ্যাপি লাগছে বুঝলে পার্টনার। এবার বল তো, সবই তো হাতে এসে গেছে, আসল মালটা হাতে পাব কী করে?'

'সেটা তো আমারও চিন্তা। এত মাথা খাটিয়েও তো ক্লুটা বুঝতে পারছি না। তবে চিন্তা কিন্তু একটা নয়।'

'কীরকম?'

'এই উড়ে এসে জুড়ে বসা ভেজাল লোকটা কে? লোকটা যে ভণ্ড সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মাস্টার অলরেডি ওর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছে। এ এখানে কী করছে?'

'ভূপেন দারোগাকে বলে লোকটাকে গ্রেফতার করাব পার্টনার?'

'কোন অপরাধে?'

'আহা, কিছু অপরাধ নাইবা করুক, লোকটা যে এখানে এসে বেশ একটা ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছে তার জন্য লোকটাকে ডেকে জবাবদিহি চাওয়া যায় না?'

'যায় বইকি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কি সাধিত হবে কিছু? বড়জোর লোকটাকে হ্যারাস করা যাবে কিছুদিনের জন্য। তাতে আমাদের লাভ?'

'তাহলে?' বিষ্টুচরণের গলাটা একটু নিভু নিভু শোনায়।

'একটা কথা বলি। আমার যা মনে হল, লোকটা ইতিমধ্যেই এই এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। এখন একে ধরাধরি করতে গেলে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যটাই কেঁচে যাবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আমাদের ওয়েট করতে হবে। লোকটার যদি সত্যিই আমাদের প্ল্যানে বাগড়া দেওয়ার মতলব থাকে তাহলে তাকে না হয় তখনই কাউন্টার করতে হবে। নইলে চাপ আছে।'

'আর ও যদি আমাদের শত্রুপক্ষ হয়?'

'শত্রুপক্ষ বলতে? বেজা মিত্তির তো ওপারে, লখাইও তাই। এই গুপ্তধনের ব্যাপারে এখন আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে বলে তো মনে হয় না। এখানে শত্রুপক্ষের কথাটা আসছে কোত্থেকে?'

'সেটাও কথা বটে।' বলতে বলতেই সোজা হয়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙল বিষ্টুচরণ। কিছুটা অধৈর্য সুরে বলল, 'কিন্তু টেনশন যে আর সহ্য হচ্ছে না পার্টনার। এবার তো কিছু একটা না করলেই নয়।'

অন্য লোকটি কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল শব্দ করে। মোবাইলটা নিয়ে বাইরে গেল সে। কিছুক্ষণ বাদেই দ্রুতপায়ে ফিরে এসে বলল, 'মেসেজ ফ্রম ভূপেন। ফিউ সাসপেক্টস আর মুভিং টুওয়ার্ডস টার্গেট এরিয়া। লেটস মুভ নাউ।'

বিষ্টুচরণ এইটে শুনেই তড়াক করে উঠে বসল। দ্রুতহাতে একটা কালো টিশার্ট গলাতে গলাতে বললেন, 'বুঝলে পার্টনার, আমার মন বলছিল আজই কিছু না কিছু একটা ঘটতে চলেছে, একটা হেস্তনেস্ত হয়েই যাবে।'

* * *

মাথা থেকে গলা অবধি ঢাকা কালো মাস্কটা খুলে নিতেই হাঁউমাউ করে উঠল ভজন 'আমি কিচ্ছু করিনি স্যার, মাইরি বলছি। চুরি ছেন্তাই দাঙ্গা মারপিট কিচ্ছু না। আমি একদম সাধাসিধে ছেলে স্যার। টাকাটা বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছি স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন স্যার।'

অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে একটা ভরাট কণ্ঠে ধমক ভেসে আসে, 'চোপ। একদম চেঁচামেচি করবি না। যা যা প্রশ্ন করব, তার ঠিকঠাক উত্তর দিবি। তাহলে তোকে যেমন তুলে আনা হয়েছে, ঠিক তেমন ছেড়ে আসা হবে। আর যদি চালাকি করেছিস তো গলা কেটে ডাইনিজলায় ভাসিয়ে দেব। মনে থাকে যেন।'

ভজন আবার হাঁউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল, কাঁধে একটা ভারি হাতের চাপ পড়তে চুপ করে গেল সে।

'তারপর ভজনবাবু, ভূপেন দারোগা থানায় কী বলল?'

ভজনের গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। গলার স্বরটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না?

'বলল এসব ডায়েরি ফায়েরি নিয়ে বিরক্ত করলে তোকে লক আপে চালান করে দেবে, তাই তো?'

'ভূপেন দারোগার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি স্যার। আমি গরিব লোক স্যার। মারধোর করে পয়সাকড়ি কিচ্ছু পাবেন না স্যার...'

'আহ, শাট আপ, একটাও বাড়তি কথা বলবি না। স্যার স্যার করে মাথা খারাপ করে দিল একেবারে।'

'আচ্ছা স্যার।' ভজন মিইয়ে যায় একেবারে।

'একটা কথা বল তো ভজন, টাকা পয়সা নিয়ে মানুষ কী করে?'

আচমকা এরকম একটা দার্শনিক প্রশ্ন আশা করেনি ভজন। সে মাথা চুলকোতে গিয়ে আবিষ্কার করল যে তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা।

'আজ্ঞে ভালো খায় দায়, বই টই কেনে, ঘুরতে টুরতে যায়।'

'হুম। আর অনেক অনেক টাকাপয়সা পেলে?'

'আজ্ঞে অনেক অনেক ভালো খায় দায়, অনেক অনেক বই কেনে, অনেক অনেক ঘুরতে টুরতে যায়।'

বলতে বলতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয় ভজন। যে জায়গাটায় ওকে এনেছে সেটা একটা অন্ধকার ঘর। মুখের ওপর একটা লাইট ফেলা আছে বলে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে মনে হল যে লোকটা প্রশ্ন করছে সেটাই লিডার। বাকি আরও দুজন আছে, সে দুটো নির্ঘাত এর স্যাঙাৎ হবে।

'তা ভজন, এমন অনেক অনেক টাকাপয়সার খবর চেপে রাখাটা যে ভালো কথা নয় সেটা তোকে কেউ কোনওদিন বলে দেয়নি?'

ভজন চুপ করে থাকে।

এবার লোকটা সামনে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভজনের সামনে বসে, 'ডায়েরিটা চাই রে ভজন? কোথাও ওটা?'

লোকটাকে দেখে ভজন এত অবাক হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ মুখে কথা ফুটল না। তারপর তুতলে তুতলে বলল, 'আ আ আপনি?'

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক চিনতে পেরেছিস দেখে ভালো লাগল। বিস্তারিত আলাপ পরিচয় না হয় পরে একদিন হবে। আপাতত ডায়েরিটার খোঁজ না পেলে যে চলছে না ভজনবাবু।' বলে ঝুঁকে এল লোকটা, 'ওটা চাই, এখনই।'

ভজন শুকনো গলায় বলল, 'আমার ঝোলায় আছে।'

লোকটা ঠাস করে একটা চড় কষাল ভজনের গালে। 'সেটা পেলে কি তোকে এখানে বসিয়ে রাখার প্রয়োজন হত মর্কট? তোর কি মনে হয়, আমি তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?'

থাপ্পড়টা খেয়ে একেবারে বুঝভুম্বুল হয়ে গেল ভজন। জন্মাবধি তার গায়ে কেউ হাত তোলেনি। থাপ্পড়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। গালটা জ্বালা করছিল তার, অপমানে চোখ ফেটে জল আসছিল। সে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'মাইরি বলছি, ডায়েরিটা আমার ঝোলাতেই আছে। না বিশ্বাস হলে দেখে নিন।'

লোকটা উঠে গেল। তারপর ঝোলাটা এনে উপুড় করে ফেলল ভজনের কোলে। ঝরঝর করে ভিতরের জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। তার মধ্যে ডায়েরিটার কোথাও কোনও চিহ্ন নেই।

ভজন বেকুবের মতো চেয়ে রইল সেদিকে। লোকটা কঠিন গলায় বলল, 'কী রে ভজন, ডায়েরিটা দেখতে পাচ্ছিস কোথাও?'

ভজন শূন্য চোখে সেদিকে চেয়ে রইল। এত কষ্ট করে সামলে সুমলে রাখা ডায়েরিটা নেই? কিন্তু কীভাবে?

পেছন থেকে কে যেন ভজনের চুল টেনে ধরল সজোরে। সামনের লোকটা শীতল খুনে গলায় বলল, 'বেশি চালাকি শিখেছিস, না রে ভজন? মনে করানোর অনেক উপায় আমাদের জানা আছে কিন্তু। সেসব

দেখতে চাস নাকি?'

ভজনের চোখে জল চলে এল। সেই অবস্থাতেই সে বলল 'মাইরি বলছি স্যার। ডায়েরিটা নিয়ে ভূপেন দারোগার কাছে গেছিলাম। আসার সময়েও সেটা ঝোলাতেই ছিল।'

'তারপর সেটা ঝোলা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল, তাই না?'

ভজন ছলছল চোখে সামনের লোকটার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা সেই চোখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের স্যাঙাত দুটোকে বলল, 'এর হাত দুটো খুলে দে। এক গ্লাস জলও দিস। মনে হচ্ছে ছোকরা সত্যি কথাই বলছে।' তারপর ভজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তারপর ভজনবাবু, ভালো করে গুছিয়ে বল তো, ভূপেনের ওখান থেকে বেরোবার পর কী কী হল?'

জলের গ্লাসটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করল ভজন। তারপর পুরোটা খুলে বলল। ট্রেনের সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে তার ওপর 'কাদের যেন' ঝাঁপিয়ে পড়া অবধি।

লোকটা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ভজনের দিকে। তারপর বলল, 'লোকটাকে কেমন দেখতে?'

লোকটার শীতল খুনে চোখ দেখে ভয় করছিল ভজনের। তবুও তার মধ্যেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে যথাসাধ্য বর্ণনা দিল সে।

'গলার স্বর চেনা মনে হয়েছিল?'

ভজন মাথা নাড়ে। বলে, 'গলাটা ঘষা ঘষা স্যার। প্রথমবার শুনে চেনা চেনা লাগছিল বটে। কিন্তু কার গলা সেটা সেটা অনেক মনে করেও...'

পিঠে একটা কিল নেমে আসাতে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল ভজন। উঠে বসতে একটু সময় নিল সে। তারপর হাউমাউ করে বলল 'জানি না স্যার, মাইরি বলছি। তবে গলাটা রিসেন্টলি শুনেছি, এইটুকু বলতে পারি।'

লীডার গোছের লোকটা একটা ছবি সামনে ধরে ভজনের। জিজ্ঞেস করে, 'এই লোকটাকে চিনিস ভজন?'

ছবিটা খুব মন দিয়ে দেখে ভজন। তার চোখে যেন ধাঁধা লাগে।

উদভ্রান্ত মুখে চারিদিকে চাইল ভজন, 'সে তো বলতে পারব না স্যার। তবে কাছাকাছি দেখতে।'

'বলতে পারব না শোনার জন্য তো এতদিন ধরে এখানে থানা গেড়ে বসিনি রে ভজন।' লোকটা ফের এগিয়ে এসে ভজনের মুখোমুখি বসে। ভজন একটা ঢোঁক গিলে বলে, 'একবার মনে হচ্ছে চিনি। কিন্তু ঠিক করে বলতে পারছি না স্যার। মাইরি বলছি।'

ভজনের পিছনে দাঁড়ানো স্যাঙাতটা বোধ হয় আবার কিছু একটা করার জন্য হাত ওঠাচ্ছিল। লীডার লোকটা থামাল তাকে। তারপর অন্য লোকটাকে বলল, 'মনে হচ্ছে ভজন সত্যি কথাই বলছে মোহান্তি। আমাদের চিড়িয়া যে সে চিড়িয়া নয়, সে এক আজব যন্তর, অনেক উঁচু দরের জিনিস। নিখুঁত মেক আপ করতে তার জুড়ি নেই, আর অন্তত সাত থেকে আট রকম গলায় কথা বলতে পারে। সে ভজনের চোখে ধুলো দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী?' বলে লোকটা ভজনের দিকে ফিরল, 'আর ভজনবাবু, একটা কথা বলো তো, যে লোকটা তোমার ঝোলা থেকে হাতসাফাই করে ডায়েরিটা নিয়ে গেল, তাকে হাতের কাছে পেলে তুমি কী করবে?'

ঠোঁট থেকে রক্ত পড়ছিল, সেটা হাতের চেটো দিয়ে মুছে নেয় ভজন। অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে তার মাথায় রাগ চড়ছিল। সে সিধেসরল ছেলে, জীবনে এত হ্যাঙ্গাম পোহায়নি। তার ঘরে দারিদ্র্যে থাকলেও অসুখ ছিল না। এই কালান্তক ডায়েরি এসে তার জীবনটা একেবারে তছনছ করে দিল। এত হেনস্থা, এত মারধরও কপালে ছিল তার? রাগে ক্ষোভে দুঃখে আর থাকতে পারল না ভজন। ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল সে।

উঠে দাঁড়ায় লোকটা, তারপর 'ব্যস ব্যস, এতেই হবে। মোহান্তি লেটস স্টার্ট নাউ। আমার ধারণা আজ রাতেই এই ঘুঘুডাঙার গুপ্তধনের বখেরা মিটে যাবে।'

মোহান্তি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওঁর সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?'

চওড়া হাসলেন প্রবাল চ্যাটার্জি, 'হ্যাঁ মোহান্তি, হয়েছে। হি উইল জয়েন আস অ্যাজ ওয়েল। ভজনবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক নাকি?'

মোহান্তি আপত্তি করার আগেই ভজন উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'আমি যাব। যাবই।'

'চলুক তাহলে। ভালো টোপ হবে।'

* * *

রাত প্রায় একটা। গ্রামের অন্ধকার মেঠো পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল একটা জিপ। তার ইঞ্জিনের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছিল ঠান্ডা বাতাসে। জিপ চালাচ্ছে যে মানুষটি, চোখ ছাড়া তার সারা মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। পাশের সিটে বিষ্টুচরণ, ঘন ঘন আঙুল মটকাচ্ছে, তার চোখে মুখে খেলা করছে চাপা উদ্বেগ। সে তুলনায় জিপচালক অনেক স্থির।

খানিক বাদে বিষ্টুচরণ বলল, 'পার্টনার, কী খবর দিল মাস্টার?'

'ওরা কোনওভাবে টের পেয়েছে যে আমরা আজই অ্যাকশনে নামব। তাই আর দেরি করেনি। আজ রাতেই কাজ সারতে বেরিয়ে পড়েছে।'

'কিন্তু ওরা বলতে কারা? তারা আবার এর মধ্যে এল কী করে?'

'জানি না, অকুস্থলে গেলেই বোঝা যাবে।'

'আমাদের মাস্টারকে ডেকে নিলে হত না?'

'মাস্টার জানে। সে আসছে।

'একটু বেশি রিস্ক হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা হয়তো যাচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী?'

গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা বড় বড় বটগাছ। তার নীচে জিপটা দাঁড় করাল জিপের চালক। দুজনে নামল জিপ থেকে, তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল গ্রামের ভিতরে।

মিত্তিরবাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। অন্ধকারে জমিদার বাড়িটা যেন থমথম করছে। চারিদিকে একটা ঝড়ের আগের চুপচাপ আভাস। দরজার সামনে একটু থমকে দাঁড়াল বিষ্টু। তার সঙ্গী চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'কোথাও কোনও আওয়াজ নেই কেন পার্টনার?'

'রাতের বেলায় আপনি ঠিক কীসের আওয়াজ আশা করছেন জানতে পারি স্যার?' অধৈর্য ব্যঙ্গোক্তি ভেসে এল।

'অন্তত কুকুরের আওয়াজ। গ্রামের ভিতর দিয়ে এতটা রাস্তা এলাম, একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল না?'

দাঁত চিপে সঙ্গী লোকটি বললেন, 'তার মানে ওরা এসে গেছে।' তারপর কোমর থেকে ছোট কী একটা হাতে তুলে নিল। বিষ্টু বুঝল ওটা কী। বলল 'আমার সঙ্গে কিন্তু কোনও আর্মস টার্মস কিছু নেই।'

লোকটি চাপা গলায় বলল, 'অস্ত্র লাগবে না।'

জুতোর ডগাটা দিয়ে সদর দরজায় মৃদু চাপ দিল বিষ্টু। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

কালচে নীল আকাশের বুকে দৈত্যের মতো জেগে আছে মস্ত জমিদারবাড়ি। চারিদিন শুনশান। দুজনে লাফিয়ে উঠে এল বাঁ দিকের বারান্দায়, পা টিপে টিপে এগোতে থাকল।

প্রথম দুটো ঘর নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল দুজনে। কিন্তু থমকাল তৃতীয় ঘরের সামনে এসে। বিষ্টু চাপাস্বরে বললেন, 'কী হল?'

অন্য লোকটা ফিসফিস করলেন, 'শোনা যাচ্ছে না?'

চুপ করে নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটাও আটকাবার চেষ্টা করল বিষ্টু। তারপর নির্ভুলভাবে শুনতে পেল শব্দটা।

ঘরের ভিতর থেকে একটা চাপা গোঙানির শব্দ আসছে। ইংরেজিতে যাকে বলে মাফলড ভয়েস। খুব সতর্ক কান না হলে বোঝা মুশকিল।

উদ্বিগ্ন হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল বিষ্টু, 'কেউ আছে মনে হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল সঙ্গী লোকটি। দাঁতে দাঁত চিপে বলল, 'কাউকে বেঁধে রাখা হয়েছে।' বলেই সামনের দরজাটা হাত দিয়ে খুলতে গেলেন।

তার হাত চেপে ধরলেন বিষ্টু, 'এ কী করছ পার্টনার? যদি ফাঁদ হয়?'

লোকটি চাপা গলায় বলল, 'আমাকে ফাঁদে ফেলা অত সহজ না। আপাতত আমি যা করছি চুপচাপ দেখে যাওয়াই ভালো।'

ভজন চুপচাপ বসেছিল ঘরটার ভিতর। তাকে বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে গেছে চেয়ারের সঙ্গে। ফলে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া তার পক্ষে অন্য কিছু সম্ভবও ছিল না। ঘুঘুডাঙার রাজবাড়িতে অনেক বারই এসেছে সে। কিন্তু এই ঘরে সে কখনোই ঢোকেনি। সত্যি কথা বলতে কি যখন তাকে এই ঘরে বেঁধে রাখা হচ্ছিল, তখনই ঘরের মধ্যে থাকা দামি দামি জিনিসপত্তর দেখে তার মাথা ঘুরে গেছিল তার।

চেয়ারে বাঁধা অবস্থাতেই আকাশ পাতাল ভাবছিল ভজন। আজ বিকেল থেকেই তার সঙ্গে যা যা ঘটছে সেটা মাথায় ঢুকছিল না তার। তার মধ্যে ছাই লখাই কাকারও কোনও খোঁজ নেই। ভজনের মনে হচ্ছিল যেন সবাই মিলে তাকে এক ভয়ানক আতান্তরে ফেলে উধাও হয়ে গেছে। বসে বসে সামান্য ঝিমুনি আসছিল ভজনের। হাজার হোক ঝক্কি তো দিনভর কম যায়নি তার ওপর দিয়ে। মাথাটা নেমে এসেছিল বুকের কাছে। এমনকি মন দিয়ে শুনলে ঘুঁড়ুর ঘঁড়ৎ করে নাক ডাকার আওয়াজ অবধি পাওয়া যাচ্ছিল।

এমন সময় কানের কাছে একটা চেনা বিনবিনে স্বর পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল ভজন। কে যেন তার মগজের মধ্যে সেঁধিয়ে বলছে, 'ও রে ভজু, সোনা আমার, ঘুমোলি নাকি বাপধন?'

ভজন আরেকটু হলে লাফিয়ে উঠত প্রায়। কিন্তু লীডার লোকটা বলে গেছে চেপেচুপে থাকতে। তাই সে অন্ধকারের মধ্যেই যতটা সম্ভব দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'বাব্বা, তাহলে শেষমেশ শো দিতে এলে যাই হোক। তা এদ্দিন ছিলে কোথায় কাকা? অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে রগড় দেখছিলে?'

লখাই গম্ভীর স্বরে বলল, 'নিজের কাকার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল ভজু। পইপই করে শিখিয়েছিলাম না, গুরুজনদের সঙ্গে ভক্তিটক্তি দিয়ে কথা কইবি?'

ভজন ওই অন্ধকারের মধ্যেই তীব্র দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'ভক্তি গ্যয়ি তেল লেনে। বলি সেদিন গুচ্ছের জ্ঞানট্যান দিয়ে সেই যে উধাও হলে, তারপর আজ এখানে কী মনে করে?'

'দেখ ভজু, খামোখা মাথা গরম করিসনি। এখন কী নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির সময়? গেছিলাম একটু ও পাড়ায় বেড়াতে। তোর বাপের সঙ্গে দেখা হল। গঙ্গাপদ দাদুর সঙ্গেও আড্ডা হল খানিক। রঘুপতি ঠাকুদ্দা তো ছাড়তেই চাইছিলেন না। সে তো জড়িয়ে টরিয়ে ধরে কী আদর কী আদর...'

ভজন তেড়িয়া হয়ে বলল, 'ইঃ, কচি খোকা আমার, বুড়ো দাদুর কোলে শুয়ে আদর খাচ্ছেন। ইদিকে যে ঝোলা থেকে যে ডায়েরিটা হাপিস করে নিয়ে গেল, তার বেলা কী কচ্ছিলে শুনি?'

এবার অন্য একটা স্বর শোনা গেল, লখাইয়ের থেকে একটু ভারি। 'সেটা আমরা ভেবেচিন্তেই করতে দিয়েছি রে ভজন। নইলে কাজটা এগোচ্ছিল না। বলি ফুটবল খেলা দেখেছিস তো?'

ভজন তুম্বোমুখে বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি।'

'সেরা খেলোয়াড় কি সবসময় নিজের পায়ে বল রাখে রে পাগলা? সে খেলায়, সবাইকে দিয়ে খেলায়। খেলাতে খেলাতে টুক করে শেষে গিয়ে গোলটা করে দিয়ে আসে। এটাও সেরকম ধরে নে। ধরে নে বলটা

না হয় এখন অন্যদের পায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তারা খেলতে খেলতে বলটা গোলের কাছে এলেই ফেলেছে প্রায়। এরপর টুক করে গিয়ে পা ছুঁইয়ে জালে জড়িয়ে দিতে হবে, এই যা।'

ভজন গম্ভীরস্বরে বলল, 'তা খেলাটা এখন কোন পর্যায়ে আছে বেজাকাকা? হাফটাইম হয়েছে?'

'খেলা শেষ হয়ে এসেছে রে ভজন। এখন এক্কেবারে চোখ কান খোলা রেখে টানটান হয়ে বোস দিকিনি। আজই ফয়সালা হয়ে যাবে কেসটার।'

ফের লখাইয়ের গলা শোনা গেল, 'শোন ভজন, রঘু ঠাকুদ্দার কাছ থেকে কয়েকটা মন্তর জেনে এলুম বুঝলি। কানটা খোল, চুপিচুপি কয়ে দিই।'

'কান খোলাই আছে কাকা, আমি হাতি নই যে ইচ্ছেমতো কান খুলতে আর বন্ধ করতে পারব।'

'ইঃ, ছোঁড়ার ট্যাকট্যাকে কথা শোনো। মনে হয় দুম করে পিঠে কিল বসিয়ে দিই হতচ্ছাড়ার।'

'আহ, তোরা ফের শুরু করলি? তাড়াতাড়ি কর লখাই। ওরা এসে পড়ল প্রায়।'

কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল দুটো ছায়া। একজনের হাতে একটা টর্চ। সেটা জ্বলে উঠতেই আলোর রেখা এসে পড়ল ভজনের মুখে। একটা উল্লাসের শব্দ শোনা গেল, 'বাহ বাহ, এ যে দেখছি ট্রী'তে না উঠেই এক কাঁদি পার্টনার। মক্কেল তো দেখছি এখানেই বডি ফেলেছে।'

দু-জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা ভজনের সামনে এসে। বিষ্টুর সঙ্গী চিন্তিতস্বরে লোকটি বলল, 'এ তো ভালো লক্ষণ নয়।'

'হোয়াই পার্টনার, হোয়াই?'

'এ এখানে কেন? একে বেঁধে রেখেই বা গেল কে?'

'আমার মনে হয় এ বোধহয় ডায়েরিটা হারিয়ে ফেলে দিশেহারা হয়ে এখানে এসে পড়েছে, বুঝলে হে। ব্যাটা ভেবেছে যারা ডায়েরি চুরি করেছে তারা এখানেই আসবে, আর ও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডায়েরিটা কেড়ে নেবে, হে হে। আর মাস্টার তখন একে দেখতে পেয়ে দুটো রদ্দা মেরে কাবু করে বেঁধে রেখে গেছে।'

'চিন্তাভাবনা যে খুবই শিশুসুলভ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাস্টার কই?'

'হবে কোথাও আশেপাশেই। আপাতত ছোঁড়াকে উদ্ধার করা যাক। হয়তো এই ডায়েরিটার হেঁয়ালির ব্যাপারে কিছু বলতেও পারে। কী বলো?'

কথাগুলো শুনতে শুনতে জমে যাচ্ছিল ভজন। বিষ্টু নয়, তার সঙ্গী লোকটির গলা শুনে। হায় ঈশ্বর! শেষে এই লোকটা? এর কথা তো সে স্বপ্নেও ভাবেনি!

ঠিক সেই সময়েই মগজের মধ্যে কেমন যেন একটা ধোঁয়াশা মতো ছেয়ে গেল ভজনের। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করে উঠল, তারপর চেতনা টেতনা সবকিছু নিঃসাড়ে শুয়ে পড়তে লাগল। মনে হল তার হাত পা কোন মন্ত্রবলে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আর তখনই কে যেন সামান্য খোনা গলায় বলে উঠল, 'ভয় পাসনি নাতি। লখাইয়ের কাছে সব শুনলুম বটে। আমার বংশধরকে তারই বাড়ি থেকে উৎখাত করবে এত সাহস ওই বিষ্টুর? তাই তো সব ছেড়েছুড়ে নেমে এলুম রে খোকা। হাজার হোক তুই আমার রক্ত বটেক। এবার শরীরটা ছেড়ে দে দেখি। বাকি যা করার আমি আর লখাইই করছি। রমেনবাবুমশায় তো এমনি এমনি আমাকে তেনার ডান হাত বানাননি।'

দ্বিতীয় লোকটা একটা ছুরি বার করল পকেট থেকে। তারপর সেটা দিয়ে দড়িগুলো কাটল এক এক করে। দড়ি কাটা শেষ করে বিষ্টুর কাছ থেকে একটা জলের বোতল চেয়ে নিল। তারপর সেখানে থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে ভজনের মুখে ছিটিয়ে দিল খানিক।

ভজন অনেক চেষ্টা করে চোখটা খুলল। তারপর সামনের লোকটার দিকে চেয়ে সামান্য অচেনা গলায় বলল, 'এ কী মাস্টারমশাই, আপনি এখানে?'

গগন মল্লিক পকেট থেকে একটা লাল রঙের ডায়েরি বার করে বাঁকা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভজন, আমিই। এবার ডায়েরিটার সংকেতের ব্যাপারে সুড়সুড় করে যা জানিস বলে ফেল দেখি। মাস্টার অনেক আশা করে বসে আছে যে।'

* * *

তিনজন লোক নাটমন্দিরের ভিতরে দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে। তাদের সবার কানে অত্যাধুনিক মাইক্রোফোন বসানো। অতন্দ্র অটল প্রহরীর মতো তারা কান পেতে ছিল পাশের ঘরে ঘটে যাওয়া কথোপকথনের দিকে।

মোহান্তি 'অস্ফুটে বলল, মাই গড! গগন মল্লিক? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না স্যার।'

প্রবাল চ্যাটার্জি দাঁত চেপে চেপে বলল, 'বোঝা উচিত ছিল মোহান্তি। ডায়েরিটা খুঁজে পাওয়ার পর ভজন যে দুজনকে সে ব্যাপারে জানিয়েছিল তাদের মধ্যে গগন মল্লিকও ছিল। আমরা বোকা তাই এই সহজ সত্যিটা বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু মাস্টার? এই মাস্টার আবার কে?'

প্রবাল চ্যাটার্জি কিছু জবাব দেওয়ার আগেই মাইক্রোফোনে অন্য কিছু ভেসে এল। তিনজনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

'এটা কী বলছে স্যার?'

ভুরু কুঁচকে গেল প্রবালের, 'খুব সম্ভবত ডায়েরিতে লেখা সংকেতগুলো বলছে ভজন।'

'কিন্তু ভাষাটা তো চেনা লাগছে না।'

'চেনা লাগার কথা মোহান্তি। ওটা কিন্তু বাংলা।'

'সে কী? শুনে বুঝতে পারছি না কেন?'

'কারণ ওটা একটু পুরোনো বাংলা। সামান্য মাথা ঠান্ডা করে শুনলেই কথাগুলো বুঝতে পারবে। এমন কিছু শক্ত নয়। তবে চিন্তা অন্য জায়গায়।'

'কী স্যার?'

প্রবাল চ্যাটার্জি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই ভেসে এল দরজা খোলার শব্দ। চুপ করে গেল বাকি দুজন।

দরজার বাইরে তিনটে পায়ের শব্দ। ধীরে ধীরে তারা মিলিয়ে গেল। একটু অপেক্ষা করে বেরিয়ে এল এই তিনজন।

'ওরা কোনদিকে গেল স্যার?'

'খুব সম্ভবত বুড়োশিবের মন্দিরের দিকে।'

আরও তিনটে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

* * *

বহুদিন বাদে বুড়োশিবের মন্দিরে আলো জ্বলেছে ফের। মন্দিরের মধ্যে দুটো ছোট কিন্তু শক্তিশালী এল ই ডি ল্যাম্প জ্বলছে। তাতে গর্ভগৃহ আলোয় আলোময়। মন্দিরের বাইরে চার পাঁচটা লোক ঘুরছে। তাদের মধ্যে করিম খাঁ আর হরেকৃষ্ণকে চেনা যাচ্ছে। আর চেনা যাচ্ছে আরেক জনকে, গনুচোর।

মন্দিরের দরজার ঠিক সামনে তিনটে লোক। তাদের মধ্যে একজন মাঝের লোকটিকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী হে মিস্টার ভজন, এসব দেখে সেন্টেন্স হরে গেল নাকি? বলি অ্যারেঞ্জমেন্ট তো সব দেখছিস। আজই রমেন্দ্রনারায়ণের লুকিয়ে রাখা হিডেন ওয়েলথের একটা ফাইনাল সলিউশন হয়ে যাবে, বুঝলি। তবে কি না এর ওপরে তোর শেয়ারও তো কম নয়, তাই ট্রুথলি স্পিকিং, তুই একটু হেল্প করলে তোকে আমরা চীট করবো না, ন্যায্য শেয়ারই পাবি।'

ভজন সামান্য অচেনা গলায় বলল, 'সে তো বটেই, সে তো বটেই। আমরা কত পুরুষ ধরে মিত্তিরবাড়ির নিমক খেয়ে আসছি, তার ধনসম্পত্তি উদ্ধার করায় একটু সাহায্য করব না?'

বিষ্টুনারায়ণ অবাক স্বরে বলল, 'এ আবার কী বলছে পার্টনার?'

গগন মল্লিক খানিক ভুরু কুঁচকে বললেন, 'লক্ষণ ভালো না। এর গলার স্বর পালটে গেল কী করে? গলাটা চেনা চেনা লাগছে না?'

বিষ্টুচরণ একটু রাগতস্বরে বলল হয়ে 'এসব ভুলভাল স্পিকিং বন্ধ করে ওয়ার্কে লেগে পড় ভজন। ডায়েরিটায় কী বলা আছে কিছু বুঝতে পেরেছিস?'

ভজন একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু ম্যান স্যার। গগন স্যার সব জানেন, ওনাকেই জিজ্ঞেস করুন। উনিই তো সাত ক্লাসের পর ডেকে বললেন 'ওরে, মা সরস্বতীকে আর কষ্ট দিসনি। একে ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে, তার ওপর হার্টও দুর্বল...'

গগন মল্লিক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শাট আপ ভজন, কী আজেবাজে বকছিস? সাত ক্লাস কোথায়, তুই তো মাধ্যমিক অবধি পড়েছিস। সাত ক্লাস অবধি পড়েছিল তোর কাকা। সে সব তো তোর জানার কথা নয়।'

বিষ্টুচরণ হাঁ হাঁ করে উঠে বলল 'আহা, এখন আবার অ্যাংরা-অ্যাংরি কেন পার্টনার। এখন যাকে বলে হেড কুল রেখে কাজ কাজ রেসকিউ করতে হবে। ও বাবা ভজন। এসব বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আয় না বাপ।'

গগন মল্লিক ডায়েরিটা বার করে ছড়াটা ফের আবৃত্তি করলেন,

গোপন ধনেরে খোঁজে যে জন ইঙ্গিতে বোঝে
লীন হয়্যা যায় অজপদে।
কুঞ্জিকায় খোলে দ্বার দ্বারে খোলে কুঞ্জিকার
সন্ধানী বুঝেন চিত্রপটে।

এর মানে কী?

ভজন বলল, 'এর মানে হল দরজাটাই চাবি আর চাবিটাই দরজা। ছবি দেখে বুঝতে পারছেন না?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ যেটা খুলতে হবে, আর যা দিয়ে খুলতে হবে সে দুটো আসলে একই জিনিস।'

'সে আবার কী রকম কথা?' অবাক হল বিষ্টুচরণ।

'এর মানে একটাই দাঁড়ায় বিষ্টুবাবু। গুমঘর বলে কিছু নেই। ওটার কথা রটানো হয়েছিল লোকজনকে ভুল বোঝানোর জন্য। যা আছে তা এমন জায়গায় আছে যেটা সবার সামনেই খোলা পড়ে আছে, আবার নেইও। তার সন্ধান পেতে হলে অজর পায়ে বিলীন হয়ে যেতে হবে।'

'অজর পায়ে বলতে? অজ মানে তো ছাগল।' সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করেন গগন মল্লিক।

ভজন হাসিমুখে শিবলিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করল। গগন মল্লিক খানিকক্ষণ ভুরু টুরু কুঁচকে ভজনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তাঁর মুখ থেকে ধীরে ধীরে সন্দেহের ভাবটা চলে গেল সহসা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন 'তাই তো, অজ মানে তো যার জন্ম হয়নি, যে স্বয়ম্ভু, শাশ্বত। শিবের আরেক নাম অজ বটে।'

'জয় শিবশম্ভো,' বলে মাথায় হাত ঠেকাল বিষ্টু, তারপর গদগদচিত্তে বলল, 'জগদানন্দ স্বামী বলেছিলেন বটে। তাহলে কি একটা পূজাপাঠের অ্যারেঞ্জমেন্ট শুরু করতে বলব পার্টনার?'

কথাটার উত্তর দিলেন না গগন মল্লিক। খানিক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন, তারপর একটা এল ই ডি টর্চ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন শিবলিঙ্গের একেবারে গোড়ার দিকে, নিবিষ্ট মনে কী যেন খুঁজতে পাগলেন। বিষ্টুচরণ ভারী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ওখানে কী খুঁজছ পার্টনার?'

গগন মল্লিক উত্তর দিলেন না। তিনি মন দিয়ে গৌরীপট্টের নীচের দিকটা দেখছিলেন। খানিকটা দেখে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আয়না, একটা আয়না চাই, এক্ষুনি।'

বিষ্টুচরণ ভাবিত মুখে বলল, 'আয়না পাব কোত্থেকে? যতীনকাকা আর হেমনলিনীদিদি ওয়েক আপ থাকলে না হয় একটা আয়না আস্ক করে আনা যেত। কিন্তু দুইজনের ডিনারেই আজ কড়া করে স্লিপের ওষুধ

মিশিয়ে এসেছে গনুচোর। তাঁরা এখন ডেডবডির মতো ঘুমোচ্ছেন যে।'

গগন মল্লিক দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, 'ইমপসিবল। আপনার কী ধারণা বিষ্টুবাবু, যতীনকাকা আর হেমদি জেগে থাকলে আমরা গিয়ে কী বলতাম? দিদি, একটা আয়না দাও, আমরা তোমাদের বুড়োশিবের মন্দিরে তোমাদের সম্পত্তি চুরি করতে এসেছি?'

বিষ্টুচরণ খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে বলল, 'সেটাও একটা ফ্যাক্ট বটে। এসবই হচ্ছে গিয়ে মাস্টারের প্ল্যান। বাই দ্য রাস্তা, মাস্টারের কোনও খোঁজ পেলে? তার আসার কথা ছিল না এর মধ্যেই?'

গগন মল্লিক একটু চঞ্চল হয়ে বললেন, 'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। হল কী লোকটার?'

এমন সময়ে গনুচোর ফস করে একটা আয়না বার করে বলল, 'এতে কাজ চলবে স্যার?'

গগন মল্লিক আয়নাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন, 'দৌড়বে, কিন্তু এটা পেলি কোথায় তুই?'

গনুচোর সামান্য লাজুক হেসে বলল, 'আজ্ঞে ভূপেন দারোগা আজ যখন ক্ষৌরি করে মুখ ধুতে গেছে, তখন ঝেঁপে দিইচি।'

গগন মল্লিক অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'তা সেই হোঁৎকাটা গেল কই? আজ এখানে ঝামেলা পাকাতে আসবে না তো?'

বিষ্টুচরণ বলল, 'ওই মোষটার ব্যাপারে থিঙ্ক কোরো না পার্টনার, ওটাকে আমার হাতের তালুর মধ্যে ক্যাপচার করে রেখেছি। চাইকি এখন এখানে ডেকে ডিউটিতেও লাগিয়ে দিতে পারি, হে হে হে।'

গগন অবশ্য ততক্ষণে সেঁধিয়ে গেছেন গৌরীপট্ট'র নীচে। মাটিতে আয়নাটা রেখে কী যেন একটা দেখলেন, তারপর উল্লসিতস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, 'মার দিয়া কেল্লা। বিষ্টুবাবু, ডায়েরিটা নিয়ে আসুন আর একটা পেন।'

বিষ্টুচরণ আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি আর পেন? লাস্ট কবে পেন দিয়ে রাইট করেছি...'

গনুচোর একটা পেন বার করে গগন মল্লিকের হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন স্যার, এটাও ভূপেন দারোগার। কাল যখন একটা ডায়েরি লিখে কোয়ার্টারে গেছে...'

গগন মল্লিক সেটা শুনছিলেন না। গৌরীপট্ট''র নীচের দিকে পাথরে খোদাই ছিল কয়েকটা শব্দ। আপাতদৃষ্টিতে তার কোনও মানে নেই, কিন্তু আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল একটি অর্থবোধক বাক্য, 'একে একে স্পর্শ কর ত্রয়ী-ত্রিপুণ্ড্রকে। অক্ষর গণিয়া আর চিত্রটিরে দেখে।'



গগন মল্লিক সেটা পড়তে পড়তে দ্রুত লিখে ফেলছিলেন ডায়েরিতে। লেখা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'হরে, করিম, গনু, এক্ষুনি একটা উঁচু টুল আন কেউ, কুইক।'

বিষ্টুচরণ একটু এগিয়ে এসে গগন মল্লিকের কাছে একটু নীচু হয়ে বসলেন। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে উদগ্রীবস্বরে বলল 'কিছু বুঝতে পারলে পার্টনার?'

দাঁত চেপে উত্তর দিলেন গগন মল্লিক, ' নইলে আর টুল চাইব কেন বিষ্টুবাবু? ট্র্যাপিজের খেলা দেখাতে নিশ্চয়ই নয়।'

বিষ্টুচরণ একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'তা বটে। কিন্তু এখন টুল পাই কোথায়? ওরে গনু, বাবাসোনা আমার, থানা থেকে যদি একটা...'

গনুচোর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'টুল তো আর আয়না না পেন নয় কত্তা, যে গেঁড়িয়ে পকেটে করে নিয়ে আসব।'

বিষ্টুচরণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আদেশ করল, 'হরে, করিম, মিত্তিরবাড়ি থেকে একটা টুল নিয়ে আয় এক্ষুনি, যে করে হোক।'

যে সময়টা হরে আর করিম টুল আনতে নিল, সেই সময়টুকু সতর্ক চোখে চারিদিক দেখে নিলেন গগন মল্লিক। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল ধুকধুক করে। বহুদিন ধরে, বহু কষ্টে এত ঘুঁটি সাজিয়েছেন তিনি। আজ তার কিস্তিমাতের দিন।

ব্রজনারায়ণ যেদিন জানতে পারেন যে তাদের মন্দির থেকে চুরি যাওয়া তিনটে সোনার পাতের একটা আছে বিষ্টুচরণের বাড়িতে, সে এসে সেই খবর প্রথম জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু গগনকে। সেদিনই মনস্থির করেন গগন মল্লিক। ব্রজ মিত্তিরের বাড়ি থেকে পালাল তাঁরই পরামর্শে। এমনকি সে কথা বিষ্টুকে অবধি জানায়নি বেজা, তাকে এমনই বিশ্বাস করত ছেলেটা। যে পাঁচ বছর রতিকান্ত মল্লিকের বংশধরদের খোঁজে দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রায় পুরোটা চষে ফেলেছে বেজা, সেই পাঁচ বছর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল দুজনের মধ্যে। প্রথমে ল্যান্ডলাইনে, পরে মোবাইলে। বেজা নিয়মিত আপডেট পাঠাত তার বুজুম ফ্রেন্ড গগনাকে। প্ল্যান ছিল বেজা যদি প্রথম দুটো পাত যদি উদ্ধার করতে পারে, অন্তত তাতে কী লেখা ছিল সেটা, তবে ও ফিরে আসার পর বিষ্টুচরণের থেকে কোনও গতিকে তিন নম্বরটা বাগানো হবে। তারপর দুই বন্ধু মিলে উদ্ধার করবেন রমেন্দ্রনারায়ণের গুপ্তধন। সোজা কথায় যাকে বলে ডাবল ক্রস করা।

বেজাকে অবশ্য তারপর সরিয়ে দিতেন গগন। সে প্ল্যানও তাঁর তৈরিই ছিল।

গোপনে দাঁতে দাঁত ঘষলেন গগন মল্লিক। এই হুমদো বদমাশটা বেশি চালাক। ব্যাটা যে হামলা চালিয়ে ব্রজ আর লখাইকে একেবারে মেরেই ফেলবে সেটা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেননি তিনি। জানার পর আক্ষেপে নিজেকে রক্তারক্তি করতে বাকি রেখেছিলেন গগন। দোষ তাঁরই। সেদিন অনেক আলোচনার পর তিনিই বেজাকে পাঠিয়েছিলেন বিষ্টুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য। তার যে এই পরিণতি হবে কে জানত?

বেশ একটা ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছে পশ্চিম দিক থেকে। একটা রাতচরা পাখি ডেকে গেল টি টি টি করে। দূর থেকে ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। একটু দূরে পাঁচিল ঘেঁষে একটা কালকাসুন্দের ঝোপ, সেখানে থোকা থোকা জোনাকি জ্বলছে। মন্দিরের ভিতর লাইটগুলো অনেক স্তিমিত। বিষ্টুচরণ নীচু গলায় গনুচোরের সঙ্গে কী একটা আলোচনা করছে। সঙ্গী অস্ত্রধারী লোকগুলো সামান্য বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। ওরা মাস্টারের লোক। মাস্টারের কথা মনে হতে বহুদিন ধরে ভিতরে ভিতরে চেপে রাখা অস্বস্তিটা ফের মাথাচাড়া দিল গগন মল্লিকের। এই লোকটা যে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল কে জানে।

বেজা মারা যাওয়ার পর অনেক ভেবেচিন্তে উনি বিষ্টুচরণের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে পুরো ব্যাপারটাই উনি জানেন এবং বেজার অবর্তমানে এই মিশন উনি এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। সেদিন ভারী অবাক হয়েছিল বিষ্টু, তার সেই হতভম্ব থেকে ক্রমে খুশিয়াল হয়ে ওঠা মুখটা এখনও

স্পষ্ট মনে আছে গগনবাবুর। আর তিনি সেরকমই অবাক হয়েছিলেন যেদিন এই মাস্টারের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেয় বিষ্টু। লোকটার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন গগনবাবু। এই মাস্টার লোকটাকে তিনি কোনওদিনই বিশ্বাস করেননি, এখনও করেন না। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই ব্যাপারে যত কম লোক জড়ায় তত ভালো। যারা আসবে তারা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের ভাগ চাইতেই আসবে। আর গগন মল্লিকের থেকে ভালো আর কে জানে যে মিত্তিরবাড়ির গুপ্তধনের ভাগ তিনি কাউকেই দেবেন না? ব্রজকেও দিতেন না। বিষ্টুকেও দেবেন না। আর এই মাস্টার না কে, তাকে দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

দেড়শো বছর আগে রতিকান্ত মল্লিক যে ধাঁধার সুতো খুলে গেছেন তাকে গুটিয়ে স্বস্থানে ফেরাবেন একমাত্র তিনিই। এই সম্পদ উদ্ধার করে তাকে ভোগ করবেন একমাত্র তিনিই।

হরেকৃষ্ণ আর করিম একটা টুল নিয়ে ফিরে এল। গগন চাপা গলায় বললেন, 'টুলটা শিবলিঙ্গের গা ঘেঁষে রাখ। আর সব আলো শিবলিঙ্গের মাথার দিকে ফেল। যেখানে, সোনার পাত তিনটে আটকানো ছিল।'

মুহূর্তে তিনটে জোরালো আলোর স্রোত ধেয়ে গেল শতাব্দীপ্রাচীন বুড়োশিব মন্দিরের বিশাল শিবলিঙ্গের মাথার দিকে। যেখানে এককালে শোভা পেত তিন তিনখানি সোনার তৈরি ত্রিপুন্ড্রক। গগন মল্লিক গনুকে আদেশ করলেন 'একটা ব্রাশ নিয়ে আয় গনু, আর একটা জলে ভেজানো ন্যাকড়া।'

গনু সেসব নিয়ে আসার পর জায়গাটা পরিষ্কার করলেন গগন। তারপর পকেট থেকে একটা আতশকাচ বের করে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলেন।

একটু পরে আবিষ্কার করলেন, শিবলিঙ্গের মাথার দিকে দুটো উল্লম্ব সারিতে পর পর ছ'টা ছিদ্র আছে। উল্লব সারি দুটোর মাঝের দূরত্ব প্রায় ফুট খানেক। প্রথম দুটি ছিদ্রের মধ্যে প্রায় ছ'ইঞ্চির ব্যবধান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছিদ্রের মধ্যে ব্যবধান তিন ইঞ্চির মতো। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ ছিদ্রের মধ্যে সেই ছয় ইঞ্চির দূরত্ব। শেষের দুটোও তাই। কীসের ছিদ্র এগুলো?

ভুরু কুঁচকে গেল গগন মল্লিকের। কী যেন একটা ধরি ধরি করেও তাঁর কাছে ধরা দিচ্ছে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে ভজনের দিকে তাকালেন গগন। ছেলেটা জ্বলজ্বলে চোখে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে একটা শেয়ানা হাসি।

'কী রে ভজন, কিছু সাহায্য করতে পারবি নাকি?'

খ্যাঁক করে হাসল ভজন। তারপর বলল, 'পারব না কেন। সামান্য কাজ। বুড়ো ঠাকুদ্দা তো সব সুলুক সন্ধান দিয়েই দিয়েছে।'

বুড়ো ঠাকুদ্দা'র ব্যাপারটা বুঝলেন না গগন। তবে সে নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না তিনি। সময় ফুরিয়ে আসছে। তিনি দ্রুত টুল থেকে নেমে বললেন, 'এসব উদ্ভট শয়তানি রাখ ভজন, কী করতে হবে বল।'

'ওই সোনার পাত তিনটে চাই।'

'কেন?'

'ওগুলো যেখানে ছিল, ফের সেখানেই লাগাতে হবে। তবেই চিচিং ফাঁক হবে।'

মুহূর্তের মধ্যে গগন মল্লিকের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। ওগুলো যে সে ছিদ্র নয়। ওতেই সোনার পাত তিনটে আটকানো ছিল কোনও কৌশলে। সেখানে সেই পাত তিনটে ফের আটকাতে হবে। তারপর চাপ দিতে হবে, ছড়াটায় যেমন বলেছে, একে একে স্পর্শ করো ত্রয়ী ত্রিপুন্ড্রকে!

মানে ওই সোনার ত্রিপুণ্ড্রক তিনটেই আসল চাবি, ওরা শুধু গুপ্ত সংকেত লিখে রাখার আধার নয়। কুঞ্জিকায় খোলে দ্বার, দ্বারে খোলে কুঞ্জিকার, সন্ধানী বুঝেন চিত্রপটে! চাবিটাই আসলে দরজা, দরজাটাই আসলে চাবি!

গগন মল্লিক ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সেই পাত তিনটেই লাগবে? সেম সাইজের তিনটে লোহা বা অন্য ধাতুর পাত এনে লাগালে হবে না?'

ভজন দুলে দুলে বলল, 'উঁহু। বুড়ো ঠাকুদ্দার হাতের সূক্ষ্ম কাজ। আকারে আর ওজনে বিন্দুমাত্র হেরফের হলে ভেতরের কলকবজা সারাজীবনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে'।

কথাটা বুঝলেন গগন। একদম ওই তিনটে পাতই চাই। নইলে ওই গুপ্তধন উদ্ধার করার আশা বিশ বাঁও জলে। কিন্তু মাথাটা গুলিয়ে গেল তাঁর। তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু সে তিনটে সোনার পাত এখন পাব কোত্থেকে? শেষেরটা না হয় বিষ্টুর কাছে আছে। বাকি দুটো কোথায় কী করে বলব?'

ঠিক সেই সময়ে পাঁচিলের দিক থেকে কার স্বর ভেসে এল, 'সে নিয়ে চিন্তা করবেন না গগনবাবু, আমি লখনউ থেকে আসার সময় প্রথম দুটো পাত নিয়েই এসেছি।'

দুটো পা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল আলোর মধ্যে। বিষ্টুচরণ উৎফুল্লস্বরে বলে উঠল, 'এই তো মাস্টার, এতক্ষণে ফীল্ডে নেমেছে তাহলে। বলি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? গেম তো শেষ হওয়ার মুখে। পার্টনার তো কেস সলভ করেই ফেলেছে প্রায়।'

গগন মল্লিক মাস্টারের দিকে তাকাচ্ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মাস্টারের হাতে ধরা এক ফুট বাই আধ ফুট আকারের সামান্য বাঁকানো দুটো সোনার পাতের দিকে। তাঁর মুখে বিভিন্ন ভাব খেলে যাচ্ছিল পর্যায়ক্রমে তার মধ্যে আশ্চর্য, অবাক, সংশয় এবং ভয়, সবকটাই ছিল। তাঁর মাথার মধ্যে একটা পাগলাঘণ্টি বেজে উঠছিল উচ্চস্বরে। তাঁর চোখের সামনে যা হচ্ছে, তার মধ্যে ফাঁকি আছে, মস্ত ফাঁকি। কিচ্ছু ঠিকঠাক হচ্ছে না, কিচ্ছু না।

নিজের কোমরে হাত দিলেন গগন।

বিষ্টুচরণ দু-হাত বাড়িয়ে মাস্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাঁ-হাতে তার কলার ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন গগন। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে আসা প্রৌঢ় মানুষটির দিকে একটা পিস্তল তুলে ধরে তীব্রস্বরে বললেন, 'আর এগিয়ো না ডাক্তার।'

এগিয়ে আসা লোকটি থেমে গেলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এ কী গগনবাবু, আপনি না শিক্ষক। আপনার হাতে পিস্তল কেন?'

পিস্তলটা সোজা তাঁর টার্গেটের কপালের দিকে তাক করলেন গগন। তারপর স্থিরস্বরে বললেম, 'ডাক্তার এই পাত দু'খানা তোমার হাতে এল কী করে?'

বিষ্টুচরণ অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কীরকম বিহেভ পার্টনার? মাস্টারের দিকে পিস্তল তাক করেছ কেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে গগন মল্লিক বললেন, 'বিষ্টুবাবু, আপনার মাস্টার নাকি এই লাইনে একেবারে পয়লা নম্বরের এক্সপার্ট, প্রচুর গুপ্তধন উদ্ধার করেছেন, এসব আপনিই আমাকে জানিয়েছেন। ইনি নাকি আপনার পরামর্শেই দাঁতের ডাক্তার সেজে এখানে থানা গেড়েছেন। কিন্তু রতিকান্ত মল্লিকের চুরি করা সোনার পাত দুটো কোন যাদুমন্ত্রে এঁর হাতে এল সেটা কাউণ্ডলি এক্সপ্লেইন করবেন কি?'

এবার একই দিক থেকে তিনটে মানুষ হেঁটে এসে দাঁড়াল সতীশ চাকলাদারের পেছনে। তাদের হাতেও অত্যাধুনিক অস্ত্র। তিনজনের মধ্যে যাঁকে লীডার বলে মনে হয় সেই সুপুরুষ যুবকটি মৃদু হেসে বললেন, 'যাক, আপনি যে এত সহজেই পুরো গল্পের ফাঁকিটা ধরতে পেরেছেন, সেটা দেখে ভারি ভালো লাগছে গগন বাবু। আপনাকে জানাতে অশেষ আনন্দ বোধ করছি যে মাস্টার নাম নিয়ে যে মানুষটি আপনাদের সব পাপকাজের সঙ্গী হয়েছিলেন, সেই দাঁতের ডাক্তার সতীশ চাকলাদার আসলে লখনউর কিংস জর্জ কলেজের ডেন্টিস্ট্রির প্রফেসর, ডাক্তার রামশরণ গুপ্তা। যিনি রতিকান্ত মল্লিকের রক্তের উত্তরাধিকারী তো বটে, তার ওপর যিনি ব্রজ মিত্তিরের বিশেষ বন্ধুও বটে। ব্রজ মিত্তিরের খুনের খবর পেয়ে নিজেই এখানে চলে এসেছিলেন এই রহস্য উদঘাটন করতে, কাউকে না জানিয়ে। আর বাই দ্য ওয়ে, ভূপেন দারোগা কিন্তু এখন আমাদের দলে। মন্দিরের বাইরেই সে তার দলবল নিয়ে ওয়েট করছে আপনার সাদরে আপ্যায়ন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

থরথর করে হাত কাঁপছিল গগন মল্লিকের। চকিতে বিষ্টুচরণকে নিজের দিকে টেনে নিলেন গগন। তারপর পিস্তলটা তার রগে ঠেকিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'ভুল, সব ভুল। রতিকান্ত মল্লিকের উত্তরাধিকারী বলতে যদি কেউ থেকে থাকে তবে সে আমি, একমাত্র আমি। বাকি সব মিথ্যেবাদী, জোচ্চর। এই মাস্টার জাল, ওর হাতের ওই পাত সোনার পাত দুখানা জাল। তোরা সব জাল। সব কটা জোচ্চোর। আর তুই কে রে? সেই জালি তান্ত্রিকটা না? আর বাকি দুটো তোর চ্যালাচামুণ্ডা তাই তো? গনু, হরে, করিম, কোথায় তোরা? শুইয়ে দে এই বজ্জাত তিনটেকে। মাথা ফাটিয়ে ভাসিয়ে দে গঙ্গায়।

গনুকে কোথাও দেখা গেল না, এর মধ্যেই সে পালিয়েছে কোথায়। তবে হারে রে রে করে তেড়ে গেল বিষ্টুচরণের দুই পোষা গুণ্ডা। এক ধাক্কায় সতীশ চাকলাদারকে পেছনে সরিয়ে দিলেন প্রবাল চ্যাটার্জি আর তাঁর দুই সঙ্গী। তিনজনে ক্যারাটের পজিশন নিলেন।

তবে তাঁদের আর দরকার হল না। দুই দলের মধ্যে লাঠি হাতে লাফ দিয়ে পড়ল একটা মানুষ।

ভজন।

ভজনের হাতে তার কাকার লাঠিখানা যে কী করে এল সে ভগবানই জানেন। প্রচণ্ড রাগে চোখদুটো জ্বলছে তার। অচেনা গলায় সে বলল, 'সেবার তো আমার হাত থেকে কোনওমতে বেঁচে গেছিলিস তোরা। আজ কিন্তু পার পাবি না। দেখে যা লখাই সামন্তর লাঠির জোর।'

তারপর যেন তবলা লহরা খেলে গেল ভজনের হাতে। বৃষ্টির মতো লাঠির বাড়ি নেমে আসতে লাগল হরে আর করিমের ওপর। তারা খানিক লড়ার চেষ্টা করেছিল বটে, তবে দেখা গেল যে মাথায় পিঠে দুমাদ্দুম কয়েকটা লাঠির বাড়ি খেতেই তাদের জারিজুরি সব শেষ। শেষে দুটোই মাটিতে পড়ে কোঁকাতে লাগল। এই অবসরে গগন মল্লিক তাঁর পিস্তলটা ভজনের দিকে তাক করতেই প্রবাল চ্যাটার্জির রিভলবার থেকে চকিতে একটা গুলি ছুটে এসে তাঁর হাতের পিস্তলটা ছিটকে ফেলে দিল একদিকে। হ্যান্ডমাইকে ভূপেন আচায্যির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সি আই ডির স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ আপাতত এই চত্বরের দখল নিয়েছে। কেউ আইন নিজের হাতে নেবেন না। গগন মল্লিক আর বিষ্ণুচরণ তেওয়ারি, আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্মসমর্পণ করতে।'

গগন হাত তুলে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে বিষ্টুচরণ দাঁত ছরকুটে পড়ে আছে মন্দিরের সামনে। বড় বড় সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল চারিদিকে। বন্দুকধারী পুলিশের দল মার্চ করে এসে সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল।

প্রবাল চ্যাটার্জি সতীশ চাকলাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার?'

সতীশ চাকলাদার ওরফে প্রফেসর রামশরণ গুপ্তা কিছু বললেন না। তিনি হাসিমুখে তাঁর হাতে ধরা পাত দুটো এগিয়ে দিলেন ভজনের দিকে।

ভজনের দিকে তখন তাকানো যাচ্ছিল না। সে তখন আর সেই নরমসরম ছেলেটি নেই। তার চোখ জ্বলছে অঙ্গারের মতো, দাঁত কিড়মিড় করছে, কাঁধ ফুলে উঠেছে থইথই করে, মাথার চুল এলোঝেলো। সে পাত দু'খানি হাতে নিয়ে হুকুম দিল, 'তিন নম্বর পাতটা তুলে আন কেউ।'

প্রবাল চ্যাটার্জি এগিয়ে এলেন। অজ্ঞান হয়ে থাকা বিষ্টুচরণের কোমর থেকে টেনে বার করলেন একটা একটা ছ্যাৎলা পড়া পুরোনো সোনার পাত। সেটা তিনি ভজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নম্রস্বরে বললেন, 'জানি না আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, ভজন না লখাই সামন্ত। শুধু এটুকু চাইব, রমেন্দ্রনারায়ণের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের যেন একটা সদ্ব্যবহার হয়।'

ভজন জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল প্রবালের দিকে। তারপর সেই পাতটা টেনে নিয়ে লাফিয়ে উঠল শিবলিঙ্গের সামলে পেতে রাখা টুলের ওপর। তারপর দক্ষ হাতে তিনটে সোনার পাত সেঁটে দিল বুড়োশিবের কপালে।

খটাখট করে কিছু আওয়াজ ভেসে এল রাতের অন্ধকারে। তখনও তিনটে জোরাল এল ই ডি ল্যাম্পের আলো চেয়েছিল সবজেটে ছ্যাৎলা পড়া তিনটে সোনার পাতের দিকে, যে তিনটে পাত প্রায় একশো তিরিশ বছর পর ফিরে এসেছে নিজেদের জায়গায়। সেদিকে একবার সগর্বে তাকাল ভজন, যেন মোনালিসার দিকে

চেয়ে আছেন দ্য ভিঞ্চি। তারপর সে সজোরে ধাক্কা মারল তিনটি পাতের ছ'খানি কোণা বরাবর। একের পর এক।

মুহূর্ত খানেকের স্তব্ধতা। তারপর ধীর, অতি ধীর একটা ঘরঘর শব্দ উঠে আসতে লাগল বুড়োশিবের শরীর বেয়ে। সবার বিস্মিত চোখের সামনে গৌরীপট্টটি ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে। ঠিক একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে থামল সেটি। তারই সঙ্গে দু'খানি ফাটল দেখা দিল গৌরীপট্টের ওপরের অংশটির দুধারে, সেই ছ'খানি উল্লম্ব ছিদ্রসারি বরাবর।

তারপর সবার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ঘুঘুডাঙার শতাব্দী প্রাচীন বুড়ো শিবলিঙ্গের একটা অংশ দরজার মতো দু-ভাগ হয়ে গেল। আর তার মধ্যে উঁকি দিল প্রায় সমান সাইজের আরও একটি শিবলিঙ্গ। যথেষ্ট সবজেটে ছাতা পড়া অবস্থাতেও এল ই ডি আলোর ঝলকে বোঝা গেল যে তার পুরোটাই সোনার। আর তার গায়ে যে যে সব দামী পাথর বসানো আছে, তাদের ছিটকে আসা আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠল।

ভজন ঘোলাটে গলায় বলল, 'এই নিন মশাইয়েরা, রমেন মিত্তিরের গুপ্তধন।' আর তারপরই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সেই উঁচু টুল থেকে।

* * *

কফির কাপটা হাতে তুলে নিয়ে প্রবাল চ্যাটার্জি বললেন, 'সবই তো বুঝলাম প্রফেসর গুপ্তা। কিন্তু ব্রজনারায়ণ মিত্র'র সঙ্গে আপনার শেষমেশ কী কথা হয়েছিল সেটা না জানলে তো পুরো রহস্যটা খোলসা হচ্ছে না।'

কথা হচ্ছিল মিত্তিরবাড়ির উঠোনে বসে। খানপাঁচেক রট আয়রনের চেয়ার পাতা। তাতে প্রবাল চ্যাটার্জি, দেবকান্ত মোহান্তি, যতীন্দ্রনারায়ণ, প্রফেসর গুপ্তা আর ভূপেন আচায্যি বসে। মাঝখানে একটা ওই রট আয়রনেরই ছোট টেবিল। তাতে কফির কাপ আর একটা কাজুর প্লেট রাখা। হেমনলিনী গরম গরম হাঁসের ডিমের বড়া ভাজছেন ভেতরে, সঙ্গে গোবিন্দভোগ চাল আর সোনামুগ ডালের খিচুড়ি। তার সুগন্ধে চারিদিক ম ম করছে। তাঁকে সাহায্য করছে ভজন। তার মাথায় মস্ত ব্যাণ্ডেজ। উঁচু টুল থেকে পড়ে যাওয়ার ফল।

একমুঠো কাজু হাতে তুলে নিয়ে প্রফেসর গুপ্তা বলতে শুরু করলেন।

আজ থেকে দেড় বছর আগে। লখনউ। ডিসেম্বরের সন্ধে।

প্রফেসর গুপ্তা কঠিনভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনিই যে সেই জমিদারবাড়ির উত্তরাধিকারী তার প্রমাণ কী?'

ব্রজনারায়ণ মিত্র খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন প্রফেসর গুপ্তার দিকে, তারপর ঠান্ডা গলায় বলেন, 'আপনি কি এই মুহূর্তে সেই প্রমাণ নেওয়ার অবস্থায় আছেন প্রফেসর গুপ্তা?'

'আছি বইকি মিস্টার মিত্র।'

'তাই নাকি?' একটা বাঁকা হাসি খেলে যায় ব্রজনারায়ণ মিত্তিরের ঠোঁটে, 'কী রকম আছেন সেটা একটু জানালে এই নাচীজ নিজেকে একটু খুশকিসমত বলে ভাবতে পারে গুপ্তাসাহেব। আমরা কিন্তু সব আঁটঘাট বেঁধেই এসেছি। আবারও জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে আপনার বাড়ির দখল আমার হাতে। আপনার সব কাজের কাজী লছমন আমাদের হাতে বন্দি। আমরা ভালো করেই জানি যে এই লছমন ছাড়া আপনার কাছের লোক বলে আর কেউ নেই। আপনার স্ত্রী মারা গেছেন বছর দশেক হল, আপনার একমাত্র ছেলে অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, তার সঙ্গে আপনার মুখ দেখাদেখি নেই। দুই চারটে ভাতিজা ভাতিজি আছে, তারাও আপনার খোঁজ নেয় না, আপনিও তাদের খোঁজ নেন না। মাঝেসাঝে দুয়েকজন পুরোনো ছাত্র ছাড়া আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার মতো তেমন কেউ নেই, কী প্রফেসর গুপ্তা, ঠিক বলছি তো?'

প্রফেসর গুপ্তা কিছু বলেন না, স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর বলেন, 'তাতেও কিন্তু আমার প্রশ্নটা তামাদি হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার মিত্র। আপনিই যে ঘুঘুডাঙার জমিদারবাড়ির উত্তরপুরুষ, তার প্রমাণ কী?'

চকিতে উঠে দাঁড়ান ব্রজনারায়ণ মিত্র, লাফিয়ে আসেন টেবিলের এপারে। বাঁ হাতে প্রফেসর গুপ্তা'র চুলের মুঠিটা ধরে ওয়েবলি স্কটটা ঠেকান কপালের ঠিক মাঝখানে। গনগনে রাগত গলায় বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনার ন্যাকামি সহ্য করছি প্রফেসর গুপ্তা, এনাফ ইজ এনাফ।'

প্রফেসর গুপ্তা স্থির চোখে ব্রজনারায়ণ মিত্তিরের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর কাটা কাটা স্বরে বলেন, 'আমার গায়ে হাত তুলে ভালো করলেন না মিস্টার মিত্র। আমি যদি মনে করি এ ব্যাপারে আপনাকে কিছুই বলব না, তাহলে আপনার পিতৃদেবেরও সাধ্য নেই আমার মুখ খোলানোর। আর আমাকে মেরে ফেললে যে ও দুটো পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না সেটা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

মুঠিটা আলগা হল। কিন্তু বন্দুকটা নড়ল না। ঠান্ডা খুনে গলায় ব্রজনারায়ণ মিত্তির বললেন, 'মুখ খোলানোর অনেক উপায় কিন্তু আমাদের জানা আছে প্রফেসর গুপ্তা।'

ব্রজ মিত্তিরের চোখে চোখ রেখে পিস্তলের নলটা কপাল থেকে সরিয়ে দিলেন প্রফেসর গুপ্তা। তারপর একটু হেসে বললেন, 'ঠান্ডা হয়ে চেয়ারে বসুন মিস্টার মিত্র। আপনি না একজন পেশাদার গুণ্ডা বদমাশ, না কোনও পুলিশ অফিসার। থার্ড ডিগ্রি বোধহয় সিনেমাতেই শুনেছেন বা দেখেছেন, বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন তো? সেটুকু নার্ভের জোর আছে তো আপনার?'

ব্রজ মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বন্দুকটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'বেশ। স্বীকার করলাম যে আমি গুণ্ডা বদমাশও নই, পুলিশও নই। নাউ, প্লিজ লেট মী নো', কী করে আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিটা আপনার খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে পারি? মানে সোজা কথায় বলতে গেলে ওই সোনার পাত দুটো কীসের বিনিময়ে আমার হাতে আপনি তুলে দেবেন?'

প্রফেসর গুপ্তা বললেন, 'দুঃখিত মিস্টার মিত্র। আপনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন যে আপনি ঘুঘুডাঙার মিত্তির বাড়ির সন্তান, তাহলে এই আলোচনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।'

'সে তো আমার পাসপোর্ট বা ভোটার আইডি কার্ড দেখেই মালুম করতে পারবেন।'

দুলে দুলে মাথা নাড়লেন প্রফেসর গুপ্তা। 'আপনি প্রফেশনাল গুণ্ডা না হতে পারেন, কিন্তু যেভাবে এসব সঙ্গীসাথী জুটিয়ে আমার বাড়িটা দখল করেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে অপরাধ জগতের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা কম নয়। ফলে কী করে বিশ্বাস করব যে আপনার আনা পাসপোর্ট বা ভোটার আইডি কার্ডটা জাল নয়?'

ঘাড়টা দুবার এদিক ওদিক করলেন ব্রজনারায়ণ। কী যেন একটা ভাবলেন, তারপর,

বললেন, 'আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় তাও মেনে নিলাম। তাহলে আপনিই বলুন ঠিক কীভাবে আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি ওই পরিবারের সন্তান?'

'এমন কিছু প্রমাণ দাখিল করুন, ট্যাঞ্জিবল বা ইন্ট্যাঞ্জিবল, যা একমাত্র ঘুঘুডাঙার মিত্রপরিবার ছাড়া আর কারও কাছে থাকা সম্ভব নয়। আবারও বলছি, সেটা ট্যাঞ্জিবল বা ইন্ট্যাঞ্জিবল, দুটোই হতে পারে।'

উঠে দাঁড়ালেন ব্রজনারায়ণ। হাত দুটো পেছনে বন্ধ করে সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তখনও পিস্তলটা তাঁর ডান হাতে ধরা আর তর্জনীটা পিস্তলের ট্রিগারে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন ব্রজনারায়ণ। তারপর চেয়ারে বসে বলেন, 'ওকে, ঠিক হ্যায়। পুরো গল্পটাই না হয় বলব আপনাকে। যদিও বিষ্টুকে আর গগনাকে আলাদা আলাদা করে কথা দিয়েছিলাম যে এই বিষয়ে আর কেউ জানবে না, তবুও সব কথা বলছি আপনাকে। তবে শুনুন প্রফেসর, কীভাবে আমি এই রহস্যের সন্ধান পেলাম। আশা করি তাতে আপনার সব সন্দেহের নিরসন হবে। কারণ ঘুঘুডাঙার রাজবাড়ির সন্তান ছাড়া এই রহস্যকাহিনী জানা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

ব্রজ মিত্তিরের ইশারায় বাকিরা ঘরের বাইরে গেল। প্রফেসর গুপ্তা গুছিয়ে বসলেন।

তার পরের আধঘণ্টা একতরফা বলে গেলেন ব্রজ মিত্তিরই। গগন মল্লিকের সঙ্গে স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব, পরে বিষ্টুচরণের সঙ্গে গা ঘষাঘষি, বিষ্টুচরণের থেকে ঘুঘুডাঙার জমিদারবাড়ির শিবলিঙ্গের সোনার ত্রিপুণ্ড্রক চুরির

আসল কাহিনী শোনা, সেই ইস্তক প্রাণের বন্ধু গগনার সঙ্গে গোপন আলোচনা, সেই আলোচনা মোতাবেক ঘর ছাড়া হওয়া, সবই খুলে বললেন তিনি। কিচ্ছু বাদ রাখলেন না।

সব শুনে মাথা নাড়লেন প্রফেসর গুপ্তা। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতটাই যখন বললেন, বিশ্বাস করে নেওয়া গেল যে আপনিই সেই গুপ্তধনের সার্থক উত্তরাধিকারী। কিন্তু একটা কথা বলুন তো মিস্টার মিত্র, দৈবগতিকে যদি সেই গোপন সম্পদের খোঁজ পেয়েও যান, তবে সেটা নিয়ে কী করবেন আপনি?'

মুহূর্ত খানিক একটা শূন্য দৃষ্টিতে প্রফেসর গুপ্তার দিকে চেয়ে থাকেন ব্রজনারায়ণ। তারপর বলেন, 'সেটা আমি ভাবিনি প্রফেসর গুপ্তা। আমি এতগুলো বছর কাটিয়েছি ওই গুপ্ত সম্পদ খুঁজে বেড়ানোর নেশায়। পেলে কী করব সেটা নিয়ে কখনই ভাবিনি।'

'হুম, বুঝেছি। তা আপনার দুই জিগিরি দোস্ত এই সম্পত্তি হাতে পেলে কী করবে সেটা তো অন্তত জানেন আপনি? নাকি তাও জানেন না?'

এই প্রথম একটু অপ্রতিভ দেখায় ব্রজনারায়ণকে। তিনি মাথা চুলকোতে বলেন, 'তারা দুজনেই ভালো লোক, বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে আগে তো গুপ্তধনটা হাতে আসুন। তারপরই না হয় বাকিটা দেখা যাবে।'

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন রামশরণ গুপ্তা। তারপর বললেন, 'আপনার সারল্য সত্যিই তারিফ করার মতো। আপনার কী ধারণা, আপনার সঙ্গীরা এতই ভালো, এতই সৎ, এতই উদার যে তারা এত ঝক্কি নিচ্ছে গুপ্তধন উদ্ধার করে হাসিমুখে আপনার হাতে তুলে দেবে বলে? তাদের কোনও স্বার্থ নেই?'

একটু অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন ব্রজনারায়ণ। তারপর বললেন, 'ওরা কিন্তু জানে আজকাল এসব গুপ্তধনটন উদ্ধার হলে সেসব গভর্নমেন্টের সম্পত্তি হয়ে যায়।'

রামশরণ গুপ্তা এবার আর অট্টহাসি হাসলেন না। খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টর মিস্টার মিত্র, আই মাস্ট সে। আপনি ডেয়ার ডেভিল লোক। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। সংগঠন ক্ষমতা ভালো, নইলে এসব অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট জোগাড় করতে পারতেন না। কথা বার্তায় রসবোধ আছে। কিন্তু বুদ্ধিখানি, মাশাল্লাহ, একেবারে শিশুর স্তরে। আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন আপনার ওই দুই গুণধর দোস্ত গুপ্তধন উদ্ধার করে দেশের সরকারের হাতে তুলে দেবে? সেই জন্যই তারা আপনাকে এত সাপোর্ট দিচ্ছে? ওই সাম তেওয়ারি না কে, সে আপনাকে এইসব সমাজবিরোধী জোগাড় করার জন্য এমনি এমনি টাকা পাঠাচ্ছে? আর ওই গগন, আপনার ছোটবেলার জিগরি দোস্ত, যার উসকানিতে আপনি এই এক্সপিডিশনে নেমেছেন, সে এত কিছু করছে আউট অফ সিম্পল ফ্রেন্ডশিপ? আর ইউ সো নাইভ?'

ব্রজনারায়ণ বিব্রতস্বরে বললেন, 'আসল প্ল্যানটা তো বললামই।'

'কোন প্ল্যান? আপনি আর গগনবাবু মিলে ওই তেওয়ারি ডাবল ক্রস করবেন, আর তারপর দুজনে মিলে রমেন মিত্তিরের গুপ্তধন উদ্ধার করবেন তাই তো? হা ঈশ্বর।'

ব্রজনারায়ণ কিছু বললেন না।'

'আপনার কী ধারণা মিস্টার মিত্র? বিষ্টুচরণ অত নিরীহ লোক? সে আপনার পেছনে এত টাকা ঢালছে এমনি এমনি? তার অন্য কোনও প্ল্যান রেডি নেই?'

'তাহলে?' এই প্রথম এই অসহায় শোনায় ব্রজনারায়ণের স্বর।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন প্রফেসর গুপ্তা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওয়েল। আরতি শ্রীবাস্তবের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমিও চাই। তবে সেই দুটো পাত এখনই আপনাকে আমি দিচ্ছি না মিস্টার মিত্র। তাতে কী কী লেখা আছে সেটা একটা ডায়েরিতে কপি করা আছে। সেটা নিয়ে যান। কিন্তু একটা কন্ডিশন আছে।'

'বলুন।'

'আমার মন বলছে আমার সাহায্য আপনার দরকার হবেই হবে। আপনি একটা কাজ করতে পারবেন? ঘুঘুডাঙা ফিরে যাওয়ার পর প্রতিদিন আমাকে একটা করে আপডেট দিতে পারবেন?'

'তাতে লাভ?'

একবার হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর গুপ্তা। তারপর বললেন, 'আমার ঠাকুমা খুব প্রিন্সিপলড মহিলা ছিলেন মিস্টার মিত্র। তিনি যদি স্বর্গ থেকে দেখেন যে তাঁর নাতির সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করা সম্পত্তি দেশের কাজে না লেগে দুটো জোচ্চর ক্রিমিনালের পকেটস্থ হচ্ছে, তাহলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে না। অতএব ওইটুকু আমাকে এনশিওর করা আমার কর্তব্য। যদি পর পর তিনদিন আপনার ফোন না পাই, তবে আমাকে সশরীরে ঘুঘুডাঙা উপস্থিত হতেই হবে।'

উঠে দাঁড়ালেন ব্রজনারায়ণ। হাতটা বাড়িয়ে একটা চওড়া হাসি হেসে বললেন, 'ডান। তাই হবে।'

* * *

'কিন্তু দুটো বিষয় স্পষ্ট হল না যে।' প্রশ্ন করলেন যতীন্দ্রনারায়ণ।

'কোন বিষয়?'

'হঠাৎ করে সাধুর বেশ ধরতে গেলেন কেন? আর প্রফেসর গুপ্তাকে খুঁজে পেলেন কী করে?'

'যদি পুলিশ হিসেবে বা সি আই ডি-র ইন্সপেক্টর হিসেবে প্রফেসর গুপ্তা'র খোঁজখবর চালাতাম তাহলে বিষ্টুচরণ অ্যান্ড কোম্পানি আগেই সাবধান হয়ে যেত। তাই সাধুর ভেক নেওয়া। আর এখানে এসেই খোঁজ নিয়েছিলাম রিসেন্ট কে কে এসে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। সতীশ চাকলাদারের ওপর নজর ছিলই। শুধু দুটো জিনিস মিলছিল না। এক, দাঁতের ডাক্তারি। ইউ পি পুলিশও বার বার তাদের রিপোর্টে প্রফেসর রামশরণ গুপ্তা বলে উল্লেখ করেছে। শেষে যখন জানলাম ইনি কিংস জর্জ কলেজের ডেনটিস্ট্রি'র অধ্যাপক তখনই বুঝলাম ইনিই তিনি। দাঁতের ডাক্তারির বদলে অন্য কোনও পেশা নিলে চট করে আইডেন্টিফাই করা অসুবিধা হত।'

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন প্রফেসর গুপ্তা, 'আসলে ওই একটা কাজই শিখেছি জীবনভোর, অন্য পেশা নেব কী করে? তাছাড়া ডাক্তারখানায় সমাজের নানা স্তরের লোকজন আসে, খবরাখবর রাখা সুবিধে হয়।'

'দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনি এত ভালো বাংলা জানলেন কী করে। সেটা খোলসা হওয়ার আগেই দেখি ইনি সাধু সন্দর্শনে এসে উপস্থিত। লুকোনো সিসিটিভি ক্যামেরায় তোলা ভিডিও পাঠিয়ে দিলাম সি আই ডি-র সাইবার ফরেনসিক ল্যাবে। তারা কনফার্ম করল ইনিই তিনি। ব্যস, সেইদিন সন্ধেবেলাতেই আলাপ করা গেল।'

কফি শেষ হয়ে গেছিল। প্রফেসর গুপ্তা পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। প্রবাল চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলুন তো প্রফেসর গুপ্তা, আপনি এত ঝরঝরে বাংলা শিখলেন কোথায়?'

প্রফেসর গুপ্তা হেসে বললেন, 'আমার পড়াশোনা কলকাতায়, মেডিকেল কলেজে। বিয়ে করি আমার সহপাঠিনী এক বাঙালি মেয়েকে। আমার শ্বশুরমশাই এই বিয়েতে একটা শর্তেই মত দিয়েছিলেন যে বাংলা ভাষাটা মাতৃভাষার মতো ঝরঝরে বলতে হবে। শুধু বলতে নয়, আমি বাংলা পড়তে আর লিখতেও পারি। কলকাতায় থাকার সময় নিয়মিত বাংলা বই পড়তাম। পরে কিংস জর্জ কলেজে জয়েন করার পর অবশ্য সে সুযোগ কমে যায়।'

ভূপেন আচায্যি একটা কাজু তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা কথা কিন্তু আমাকে খুব হন্ট করছে স্যার। বলব?'

'আপনার বিনয়টা আমাকে আজ সকাল থেকেই খুব হন্ট করছে ভূপেনবাবু। বলুন।'

'কাল গগন মল্লিকের বলা একটা কথা আমার কানে লেগে আছে, ''রতিকান্ত মল্লিকের উত্তরাধিকারী বলতে যদি কেউ থেকে থাকে তবে সে আমি, একমাত্র আমি। বাকি সব মিথ্যেবাদী, জোচ্চর।'' কেন স্যার? গগন মল্লিক হঠাৎ ও কথা বলতে গেল কেন?'

গগলসটা খুলে পকেটে রাখলেন প্রবাল চ্যাটার্জি। বললেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা, রতিকান্ত মল্লিকের বাংলায় থাকার সময় বিয়ের যে কথাটা প্রফেসর গুপ্তা উল্লেখ করলেন সেটা সত্যি। গগন মল্লিক আসলে রতিকান্ত মল্লিকের প্রথম পক্ষের বংশধর। হয়তো ঘুঘুডাঙার জমিদারবাড়ির সোনার ত্রিপুণ্ড্রক চুরির ঘটনার কথা ওদের পরিবারের মধ্যে জেনারেশন টু জেনারেশন চলে এসেছে। তাই গগন মল্লিক বিশ্বাস করতেন যে রমেন মিত্তিরের গুপ্তধনের ওপর ওঁর একটা ন্যায্য দাবি আছে।'

একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন ভূপেন দারোগা, 'সংসারের গতি বড়ই বিচিত্র। গগন মাস্টারের মতো লোক যে শেষে এই কাজ করবে কে ভেবেছিল?'

'সে তো বুঝলাম দারোগা সাহেব। এখন আপনার গতি কী হবে সেটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন?'

ভূপেন আচায্যি গড়ুরহস্ত হলেন, 'কালই গিন্নীকে দার্জিলিং মেলে তুলে দিচ্ছি স্যার, মেয়েকে নিয়ে আসবে। কলকাতায় আমার শ্বশুরবাড়ি, আর আমার বড় শালী নিবেদিতা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। এবার থেকে মেয়ে কলকাতায় থেকেই পড়াশোনা করবে। আর গাড়িটা কালই বিষ্টুবাবুর বাড়ির সামনে রেখে এসেছি।'

'শুধু তাই করলেই হবে? প্রায়শ্চিত্ত বলেও তো একটা ব্যাপার আছে মশাই।'

'বলুন স্যার, কী করতে হবে?'

'আপাতত ভজনের দায়িত্বটা নিন। তারপর বাকিটা আমি দেখছি।'

ভূপেন দারোগা নাইনটি ডিগ্রি ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যাঁ বলতেই এমন সময় দরজার কাছে একটা গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া গেল। চারজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন বিশু গুছাইত, নগেন মুহুরি, আর নরহরি চক্কোত্তি দাঁড়িয়ে। বিশু গুছাইত খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'শুনলাম কাল রাতে নাকি যতীনকাকার বাড়িতে একটা মস্ত ঝামেলা হুজ্জোত হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম নাগরিক কর্তব্যের খাতিরে একবার খবর নিয়ে যাই।'

নরহরি উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, 'কাকা, যা শুনছি সব সত্যি? শেষপর্যন্ত নাকি রমেন মিত্তিরের গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়া গেছে, আর আমাদের গগন আর বিষ্টু নাকি সেসব লুট করতে গিয়ে ধরা পড়েছে?'

'ঠিকই শুনেছ হে নরহরি। তবে ও জিনিস মস্ত জিনিস, লুট করার নয়। আপাতত পুলিশের জিম্মায় সুরক্ষিত আছে। আর গগন বিষ্টুর খবরটাও সত্যি।'

বিশু গুছাইত একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'আমি তো জানতামই গগন মল্লিক ওই রকম লোক। আরে মশাই যারা ওইসব পার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়ায় তারা কি আর ভালো লোক হয়?'

দেবকান্ত মোহান্তি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপাতত বিষ্টুচরণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খাতাপত্র নিয়ে তহকিকাত চলছে। একটু আগেই খবর পেলাম সাম গুছাইতের নামে রেগুলার একটা পেমেন্ট যেত বিষ্টুবাবুর অ্যাকাউন্ট থেকে। তা আপনি এই নামে কাউকে চেনেন নাকি মিস্টার...'

বিশু শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'এ হে হে, এই দ্যাখো। একটা জরুরি মিটিং ছিলো, এক্কেবারে ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। চলি যতীনকাকা, কোনও হেল্প লাগলে জানাবেন।'

হেমনলিনী এসে দাঁড়ালেন, 'খাবার রেডি। এরপর ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু বারবার দাঁত খিঁচোতে আসতে পারব না বাপু।'

রামশরণ গুপ্তা লাফিয়ে উঠে সশঙ্কিতস্বরে বললেন, 'দাঁত? আবার?'